কবে তুমি আস্‌বে

উড ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড বাড়ী। তাহার সুসজ্জিত ড্রইং-রুমে এক যুবক মাঝে মাঝে দেওয়ালের প্রকাণ্ড ঘড়িটার দিকে তাকাইতেছিল। একবার অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "**Boorishly unpunctual**—এরা কি আজ আসবে না? পাঁচটায় আসবার কথা, বেজে গেল স' পাঁচটা।"

ছেলেটিকে দেখিলে মনে হয় চেহারা বটে! পাইনের মত ছাঁটাই কুঞ্চিত কেশ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দেহে সুস্বাস্থ্যের দীপ্তির একান্ত অভাব। বর্ণের মধ্যে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা নাই, বড় বড় চোখ দুইটির নীচে কালি পড়িয়াছে। গ্রীষ্মবিদগ্ধ তরুর মত মুখশ্রীতে একটা রুক্ষতা। বসিয়া থাকিয়া চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে একবার সে হঠাৎ বলিল—"রোজ বিকেলে এ ছাই মাথাধরা যেন পেয়ে বসেছে।" একটু পরে ডাকিল, "কিয়ামৎ, কিয়ামৎ—।" মূল্যবান উর্দ্দিপরা সাহেবের প্রিয় ভৃত্য সেলাম করিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। হুকুম হইল—"সোডা ব্র্যাণ্ডি।" সোডা ব্র্যাণ্ডির সদ্ব্যবহার চলিতেছে, এমন সময় সদর দরোজার দারওয়ান রামদীন তেওয়ারী খবর দিল—রাস্তায় গাড়ীতে হুজুর লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। চোঁ করিয়া গ্লাসে যেটুকু বাকী ছিল শেষ করিয়া, একটা চুরুট ধরাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

গেটের কাছে প্রকাণ্ড মোটর-ল্যাণ্ডো দাঁড়াইয়া। তাহাতে রয় ও ঘোষ দুইটী কুবের-নন্দন শোভা পাইতেছিল। পিছনে মিঃ ও মিসেস বোস তাঁহাদের দুই কন্যা ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে প্রেরিত মিস গুহ বসিয়াছিলেন। বিজয়কুমারকে দেখিয়া সকলেই কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিয়া উঠিল। মহিলারাও তাহাতে যোগ দিলেন। বন্ধুগণকে মৃদুহাস্যে ও মস্তক সঞ্চালনে তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া এবং মহিলাদিগকে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বিজয় কহিল—"Let me drive—আপনারা সব আরামে বসুন।" সদ্যসুরাপানসুরভিত মুখে মেয়েদের মধ্যে সে পিছনের সীট্-এ উঠিল না। শোফার সসম্ভ্রমে সরিয়া বসিল।

হু হু শব্দে মোটর ছুটিয়াছে। বৈকালীন মুক্ত হাওয়ায় বিজয়ের মাথাধরা যেন একটু কম বোধ হইতে লাগিল। বালিগঞ্জে বিজয়ের বাগানবাড়ী আছে, বন্ধুবর্গকে সে তাহা দেখাইবে। সেখানে সান্ধ্যভোজের বন্দোবস্ত হইয়াছে। সেখান হইতে রাত সাড়ে নয়টায় এমপ্রেস্ থিয়েটারে এক রুশ-নর্ত্তকীর নাচ দেখিতে যাইবার কথা আছে।

বিজয়কুমার দত্ত এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বিলাত যায়। একুশ বৎসরে অক্সফোর্ড হইতে ডিগ্রী লইয়া দেশে ফেরে ও পর বৎসর পিতৃহীন হয়। পিতার একমাত্র পুত্র, দুই লাখ টাকার উপর সম্পত্তি—বন্ধুবান্ধবের দল জুটিতে বিলম্ব হইল না এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ফলিতে লাগিল। দেহের উপর অনিয়ম অত্যাচারে তাহার পূর্ব্বের স্যাণ্ডোর মত দেহে ঘুণ ধরিতে সুরু হইয়াছিল। ওদিকে ষ্টেটের দেনাও বাড়িয়া চলিয়াছে। হুইস্কি শ্যাম্পেন, রেস্ খেলা, অভিনেত্রীদের পেট্রনাইজ করা—কোন ধনীসুলভ প্রগতিতেই সে পিছু-পা নয়। কিন্তু দুনিয়ায় এক জাতীয় লোক আছে মানুষ হিসাবে যাহারা এমন একটা আনন্দের ছোঁয়া দেয় যে তাহাদের ভালো না বাসিয়া উপায় নাই। চেহারা তাহার সুশ্রী, কণ্ঠস্বর মিষ্ট, অমায়িক

তাহার ব্যবহার। কিন্তু এই-ই সে-আকর্ষণের যথেষ্ট কারণ নয়। এ মানুটী সেই জাতীয়।

মোটর সার্কুলার রোডের কাছাকাছি আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল খালি ছোট্ট টম্‌টমে জোতা একটা মস্ত ঘোড়া ক্ষেপিয়া তীরবেগে ছুটিয়াছে। পলক ফেলিতে না ফেলিতে তাহা হুড়মুড় করিয়া মোটরের উপর আসিয়া পড়িল। বিষয় চক্ষের নিমেশে পাশ কাটাইল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিল না; টম্‌টমের চাকা টম্‌টরের পা-দানীতে একটু ধাক্কা লাগিল—সুবৃহৎ মোটরের তাহাতে কিছুই হইল না—কিন্তু টম্‌টম্‌খানা কাৎ হইয়া পড়িয়া একখানা চাকা একেবারে চুরমার হইয়া গেল—আর একখানা চাকা বোঁ বোঁ করিয়া শূন্যে কিছুক্ষণ কুমারের চাকের মত ঘুরিতে লাগিল। কোচ্‌ম্যান প্রায় পাঁচ ছয় হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। ব্রেক করিয়া বিজয়কুমার সর্বপ্রথম লাফাইয়া পড়িয়া লোকটাকে তুলিয়া দেখিল তাহার বাঁ হাতে চোট লাগিয়াছে এবং হাঁটুর কাছ দিয়া খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। মিঃ রায় অমেরিকা প্রত্যাগত টাট্‌কা ডাক্তার, তিনি কহিলেন—হাত ভাঙে নাই, সামান্য Sprain হইয়াছে মাত্র। ততক্ষণে সেখানে ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। বিজয় তাহাদের শোফারকে ডাকিয়া কহিল "তুমি লোকটাকে এখনি একটা **taxi** করে হাসপাতালে নিয়ে যাও—ভাঙা গাড়ীটা একটা পুলিশের জিম্মায় এখানেই থাক—ওর আড্ডায় খবর দিলে তারা নিয়ে-টিয়ে যাবে এখন।" ট্যাক্সি ডাকিয়া লোকটাকে তাহাতে উঠাইবার সময় বিজয় পকেট হইতে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। লোকটার বিস্ময়াভিভূত আপত্তির মস্তক সঞ্চালনের উত্তরে বিজয় সশব্দে গাড়ীর দরোজা বন্ধ করিয়া পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে বলিয়া দিল—'**medical college hospital** লে যানা।'

নিজেদের মোটরের কাছে ফিরিয়া গিয়া বিজয় দেখিল, সব কয়টি মহিলার মুখেই তখনো ভীতির ছাপ সুস্পষ্ট। বন্ধুবর্গ একে একে গাড়ীতে উঠিলে বিজয় আবার মোটর চালাইল। রয় বলিলেন—'বিজয় পঞ্চাশ পঞ্চাশটা টাকা লোকটাকে দিলে হে—অথচ দোষ কিন্তু ওরই—

মিত্র বলিলেন 'তা বটেই তো'—

মিসেস বোস ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি টানিয়া বলিলেন 'বিজয় একটু **improvident** তা তো আজ নতুন কথা নয়'—বলিয়া বিজয়ের পানে চাহিলেন। বিজয় তখন সতর্কভাবে রাস্তার দিকে তাকাইয়া হর্ণ টিপিতেছে—এসব কথা তাহার কানে পৌছাইতেছিল কি না সন্দেহ। মিস্ বোস ও মিস্ গুহ যে তাহার পানে তখন উজ্জ্বল দৃষ্টি ফেলিয়া তাহাকে নন্দিত করিতেছিল তাহাও তাহার খেয়াল ছিল না।

*　*　*　*　*

Empress theatreএ নাচের পর বিজয়কুমার বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইল। গেটের সামনে বিজয়ের নিজের মোটর দাঁড়াইয়াছিল, বাড়ী হইতে রওনা হইবার সময়ই সে নিজের শোফারকে বলিয়া আসিয়াছিল যে নাচের পর সে অন্য স্থানে যাইবে; তাহার মোটর যেন **theatre**এর দরোজায় হাজির থাকে।

বিজয়ের গাড়ী যাইয়া চিৎপুর রোডে একখানি বড় বাড়ীর সাম্‌নে থামিলে সে নামিয়া বরাবর দোতালায় উঠিয়া গিয়া এক দরোজায় ধাক্কা মারিল। সকলে ভিতরে ঘুমাইয়া। দুই তিন বার ধাক্কার পর স্ত্রীকণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল "কে ?"—আমি—"

"কে ?—বিজয়বাবু ?—এত রাত্রে যে—?"

ঝি দরোজা খুলিয়া দিল। বিজয় চৌকীতে অর্দ্ধশায়িতা এক তন্বঙ্গী

সুন্দরীর পার্শ্বে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"**Empire**এ **Pavlova**র নাচ দেখতে গিয়াছিলাম, ফেরবার বেলা ভাবলাম কাল আসতে পারিনি—আজ তুমি কেমন আছ দেখে যাই। তোমার গলার ঘা কি কমেছে?"

"হুঁ—না—**Pavlova**কে কেমন দেখ্‌লে বল—"

"কোন্দল স্বরু করবে বুঝি?—সেটি হচ্ছে না আজ—তোমার চাইতে দেখতে ভালো নয়। ওসব কথা যেতে দাও, মাথাধরাটাই বা কেমন—" বলিয়া আস্তে সে রমণীর মাথায় হাত রাখিল।

"বোধ হয় আজ একটু কম—"

বিজয় দাঁড়াইল বলিল "এত রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রেখে বিরক্ত করা ঠিক হবে না; আমি এখন আসি—কাল হয়তো আস্‌ব—" বলিয়া পা বাড়াইতেই মেয়েটি বলিল, "কিছু টাকা যদি দিয়ে যেতে পারো—এই বার ব্যামোতে পড়ে এমন খরচান্তে পড়েছি—'

উত্তরে বিজয় ব্যাগ খুলিয়া এক শ' টাকার দু'খানা নোট রমণীর বালিশের তলায় গুঁজিয়া রাখিয়া বলিল—"আজ আর কাছে এখন নেই, যদি আরো এখনি দরকার হয় তো কাল—"

"কালই আর দরকার হবে না—"বলিয়া স্মিতমুখে বিজয়ের হাতদুখানি টানিয়া লইয়া তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল "আচ্ছা এসো গে—বিজয় একবার মুচ্‌কি হাসিয়া ঝিকে দরোজা বন্ধ করিতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার পায়ের শব্দ মিলাইলে ঝি-টি অনুচ্চস্বরে বলিল, "তুমি যে কেমন দিদিমণি, কালই হয়তো চাইলে আর দু' শো পেতে তা বল্লে দরকার নেই—"

"তুই থামতো, তোর চাইতে আমার ঘটে বুদ্ধি একেবারে কম নেই বোধ হয়, তুই এখন ঘুমো।"

রমণী মিস্‌ তরুবালা। কে না জানে তাকে—বাসন্তী থিয়েটারের **star** সে।

* * * * *

বিজয় বাড়ী ফিরিয়া জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে দেখিল—টেবিলের উপরে বৈকালিক মেল্‌এর খান দুই চিঠি পড়িয়া আছে। একখানার ছাপানো শিরোনামার উপরে চোখ বুলাইয়া সেটা ব্লট্রারের পাশে গুঁজিয়া রাখিয়া সে আর একখানা চিঠি খুলিয়া পড়িতে বসিল। সেখানে তাহার বৃদ্ধা পিসিমা লিখিয়াছেন। পিসিমা চক্রপুরেই প্রায় থাকেন। তিনি বিধবা নিঃসন্তানা, বিজয়কে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাহার পিসামহাশয়ও তাহাকে অতিরিক্ত ভালবাসিতেন এবং মরিবার সময় উইল করিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার পত্নী পোষ্যপুত্রাদি গ্রহণ না করিলে পুত্রোপম বিজয়ই তাঁহার লাখখানেক টাকার সম্পত্তির মালিক হইবে। যে পিসিমার পোষ্য লওয়া-না-লওয়ার উপরে বিজয়ের লাখখানেক টাকার সম্পত্তির মালিক হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে এ হেন পিসিমা তাহাকে লিখিয়াছেন, তিনি বাতের বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন এবং একা একা তাঁহার আর ভালো লাগিতেছে না; অতএব বিজয় পত্রপাঠমাত্র একবার চক্রধরপুর চলিয়া আসিলে তিনি বিশেষ খুসী হইবেন।

পত্রখানা বার দুই পাড়য়া সে টেবিলের উপর খানিকক্ষণ তর্জ্জনী দিয়া ধীরে ধীরে ঠুকিতে লাগিল। হঠাৎ ঘড়ির টং করিয়া একটা বাজার আওয়াজে সে যেন সম্বিৎ পাইয়া সুইচ টানিয়া পাশেই শোবার ঘরে শুইতে গেল।

পরদিন প্রত্যুষে টেলিফোঁতে ম্যানেজারকে বম্বে মেলে চক্রধরপুর পর্য্যন্ত একখানা বার্থ রিজার্ভ করিতে বলিয়া বেয়ারাকে দিয়া কতকগুলি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান পত্র সে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিল।

মিস্‌ তরুবালার কাছেও ডাকে একখানা চিঠি গেল—'আমি পিসিমার ব্যামোতে হঠাৎ চক্রধরপুর চলিলাম। শীঘ্রই ফিরিব। চিঠিপত্র লিখিও না। সপ্তাহখানেক পরে তোমার ঔষধ পথ্যাদির জন্য আর দুইশো টাকা ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইব। ইতি'

২

চক্রধরপুর সেদিন পৌঁছিয়া পিসিমার আদর আপ্যায়ন ও সোহাগের অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় বিজয়কুমার অলসভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে মাইলখানেক দূরে একটা টিলার গোড়ায় মহুয়া গাছের নীচে দেহ এলাইয়া দিল। স্বমুখ নিঃসৃত সিগারেটের ধূমকুণ্ডলীর পানে তাকাইতে তাকাইতে সে ভাবিতেছিল। যে কোথায় আজ মিস বোসএর জন্মদিন উপলক্ষে তাহাদের বাড়ীতে সে চটুল বাক্‌চাতুর্য্যে ও রংঢংএ আসর জমাইয়া তুলিবে—তা না সে এই বেহারের সুদূর পল্লীতে রুগ্না বৃদ্ধা পিসিমার খবরদারী করিতে আসিয়া মহুয়া গাছের তলায় বসিয়া চুরুট ফুঁকিতেছে! মিস্‌ বোস কি ভাবে তাহাকে সেদিন বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—সে উপস্থিত না থাকাতে সে কিরূপ মনক্ষুন্ন হইবে—এই সব সাত-পাঁচ কল্পনা করিয়া মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটি-ফুটি করিয়া মিলাইতেছে।

হঠাৎ বিজয়কুমার চমকিয়া উঠিল। কোথা হইতে স্ত্রীকণ্ঠে অতি মিষ্টি গানের আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে শালগাছের শন্‌শনানি শব্দের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে! তখন শুক্লা একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে, ফুটফুটে রূপালী রংএর হাওয়ার-শাড়ীতে যেন ঝোপ-ঝাড় পাহাড় মাটি সব মুড়িয়া দিয়াছে।

বিজয়কুমার ত্রস্তে একবার চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না—অস্ফুটে বলিল, "বাঃ মন্দ নয়—অশরীরী গায়িকার গানের সঙ্গে সঙ্গে এ তাজ্জব দেশে হয়তো হুরীর নাচ এখনি স্নুরু হবে, আমি বাবা নড়্‌ছি না!" গানের স্নুর তখনও ভাসিয়া আসিতেছিল—

"আজ শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাহারা শশী
স্বপ্ন পারাবারের খেয়ায় একলা চালায় বসি—"

মিনিট পাঁচেক নিঃসাড় হইয়া বিজয়কুমার পড়িয়া রহিল—তারপর আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল—নাঃ বার করতেই হচ্ছে কোথা থেকে এ আওয়াজ আস্‌ছে। যাঁর গলার আওয়াজেই এত মধু তাঁর চোখের চাউনিতে না জানি কি-ই হবে—" বলিয়া ফিক্ করিয়া আপন মনে একটু হাসিয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

কয়েক পা' আগাইয়া একটা প্রকাণ্ড পাথরের খণ্ড পার হইয়া যাইতেই দেখিল, অনতিদূরে আর একটা ছোট পাথরের উপর বসিয়া একটি মেয়ে গান গাহিতেছিল—একা। বিজয়কুমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেই গানের শেষ চরণ থামিয়া গেল। তাহার কৌতূহল হইলেও মেয়েটির চেহারার কিছুমাত্র দেখা যাইতেছিল না—শুধু ধব্‌ধবে শাদা কাপড় ও ব্লাউজের উপর জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়া তাহাদের শুভ্রতাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল মাত্র। বিজয়কুমারের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। কে এই একাকিনী বঙ্গবালা নির্ভয়ে সন্ধ্যার পারে একা বসিয়া নিদ্রাহারা শশীর সঙ্গে আত্মহারা হইয়া মর্ম্মকথা কহিতেছে? সে মেয়েটির দিকে চোখ রাখিয়া রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা পাশ দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। সে যখন মেয়েটির হাত দশেক দূরে আসিয়াছে তখন তাহার রাস্তার দিকে মোটে দৃষ্টি ছিল না—অদম্য ঔৎসুক্যে সে

বালিকার নিশ্চল দেহের প্রতি চাহিয়া চলিতেছিল যে যদি কোনো মতে মুখ ফিরাইতে বা কোনো প্রকারের অঙ্গসঞ্চালনে তাহার মুখখানি এক নিমিষের জন্যও চোখে পড়িয়া যায়! অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চলার জন্য পথে যে মস্ত একটা গভীর ভাঙা ছিল তাহা বিজয়ের চোখে পড়ে নাই—হঠাৎ সমতল ভূমি হইতে গর্ত্তে পা পড়ায় বিজয় সশব্দে সেই ভাঙার মধ্যে পড়িয়া গেল। গুরুভার পতনের শব্দে ও অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া মেয়েটি ত্রস্তে রাস্তার সেইখানে ছুটিয়া আসিল ও কোনো কিছু বিচার মাত্র না করিয়া লাফ দিয়া সেই ভাঙার মধ্যে নামিয়া বিজযের বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল, "বহুত ভারী চোট্ লাগা হ্যায় ভাইয়া!" বিজয় সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না।" ভাঙার নীচে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটি বিজয়কে স্থানীয় কোনো লোক ভাবিয়াই হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করিয়াছিল,—চক্রধরপুরের আশে পাশে সবাই তাহাকে জানে—সে এই তের বছর তো এইখানেই আছে। বিজয়ের বাংলায় উত্তর শুনিয়া সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আপনি দেখছি বাঙালী—আচ্ছা, বেশী চোট না লেগে থাক্‌লে—" পুনরায় মাটী ধরিয়া লাফ দিয়া ভাঙার উপরে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল—"বেশী না লেগে থাক্‌লে আমার এই হাত ধরে উঠুন—আপনি ভয় করবেন না, আমি পড়ে যাবো না—" উত্তরে কিছু না বলিয়া বিজয় মেয়েটিরই মত লাফ দিয়া উপরে উঠিয়া পড়িয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল, "যাক্, তাহলে বেশী লাগে নি- -এটা তো প্রায় দিন পনেরো হল ভাঙা রয়েছে, আপনি বোধ হয় এখানে নূতন এসেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"এঃ. কনুইটার কাছে আপনার কেটে গিয়েছে দেখছি, জলপটি দিতে পারলে ভালো হতো—কিন্তু কাছে তো কোথাও জল নেই"—

বিজয় এবার মুখ তুলিয়া বালিকার মুখের উপর তাহার চোখ রাখিয়া বলিল, আপনি অনর্থক এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না, আমার বাসা বেশী দূর নয় —মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে যাব।" এইবার বিজয় বালিকার অবয়ব লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিল—বালিকা গৌরী, হয়ত সুন্দরী, সব চাইতে চোখে পড়ে তাহার স্বাস্থ্যের নিটোলতা, নিঃসঙ্কোচ ভঙ্গিমা, চাহনিতে শিশুর সারল্য। বিজয়কুমার—রমণীর রূপ যাহার কাছে গত সাত বৎসর হইতে একটা **study**র বিষয় ছিল, তাহার কাছে এই বালিকার মধ্যে রূপের অসাধারণত্ব কিছু না পড়িবারই কথা।

মেয়েটি দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"আচ্ছা আমি আসি তাহলে—আপনি একটু সতর্ক হয়ে যাবেন—রাস্তাটা অনেক দিন ধরে' মেরামত হয় না, পাথরে হোঁচট খেতে পারেন, আপনি বিশেষতঃ যখন রাস্তার সঙ্গে পরিচিত ন'ন। আমি যাবো না, মাঠের ভেতর দিয়ে **cross** করব। ওদিককার লাইনের ঐ যে শেষের বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, ঐটেই আমাদের। এইখান দিয়েই সোজা হবে—" তারপর মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

৩

দেহের উপর নানা অত্যাচারে বিজয়কুমারের একেই ভাল ঘুম হইত না—সেদিন আরো হইল না। ভোর সময়ে একটু তন্দ্রার মত হইয়াছিল, স্বপ্নে দেখিল কল্যকার সেই বালিকা তাহার হাতে জলপটি বাঁধিয়া দিতেছে। এমন সময় ঘুম ভাঙিল। হাই তুলিতে তুলিতে নিজের মনে মৃদুহাস্য করিয়া সে বলিল "**I see I am falling in love with this**

girl of the hills !" পরে তাড়াতাড়ি পাশের বাথরুমে ঢুকিয়া মুখ ধুইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে একটা চুরুট ধরাইবে এমন সময় পিসিমা দ্বারদেশে দেখা দিলেন—"আচ্ছা বিজু, এই বেলা সাতটা অবধি তুই এখনো ঘুমোস্—দু-দুবার তোর জন্য চা করিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—"

চট্ করিয়া দেশ্‌লাইর বাক্সশুদ্ধ সিগারেট কেস্‌টা পকেটে ফেলিয়া বিজয় কহিল, "না পিসিমা, আজই বড্ড দেরী হয়ে গেছে—এ চমৎকার জায়গায় যে চমৎকার ঘুম হয়—" মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পিসিমা কহিলেন, "তা বল্‌তে—তাই না তোর পিসেমশাই চক্রধরপুর এলে আর নড়্‌তে চাইতেন না। কিন্তু আমার বাতটা কিছুতেই ছাড়লো না—এই গাঁটে গাঁটে যা ব্যাথা—উঃ রাতে চোখে পাতা বোধ হয় দু' দণ্ডও এক করতে পারিনে—ভগবান এত লোককে রোজ নিচ্ছেন আমায় চোখেও দেখেন না—"

এমন সময় ভৃত্য আবার চা লইয়া আসিল ; পিসিমার বাক্য স্রোতের মুখে 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া যথাসাধ্য পাথর চাপা দিয়া চা শেষ হইলে বিজয় বলিল, "তা হলে পিসিমা একটু ঘুরে আসি—"

—"তা আয় বাবা—কিন্তু রোদ চড়লে বেশী বাইরে থাকিস্ নে—"

রাস্তার বাহির হইয়া বিজয় এতক্ষণে সিগারেটে আগুন ধরাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কতকটা পুরাতন পন্থানুবর্ত্তিনী পিসিমার কাছে সে নানা বিবেচনা করিয়াই চুরুট-ফুরুট টানিত না।

হাঁটিতে হাঁটিতে সে শহরতলীর দিকে গেল। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতেই নোংরা বস্তি আর রাস্তার ধূলার উৎপাতে অন্যদিকে পা চালাইতে না চালাইতে বিড়বিড় করিয়া বলিল—"পিসিমার জ্বালায় এ নরকে যে কত দিন থাকতে হবে কে জানে—এক দিনেই তো হাঁপিয়ে উঠেছি !" কতকদূর গিয়া বিজয় দেখিল সাম্‌নেই পোষ্টাফিস্—আটটার সময়েই খাম

পোষ্টকার্ড প্রভৃতি বিক্রয় সুরু হইয়াছে। সে অলসভাবে পোষ্টাফিসে ঢুকিয়া পড়িয়া একখানা ইন্‌সিওর করিবার খাম কিনিল—উদ্দেশ্য আজ হোক, কাল হোক তরুবালার নামে প্রতিজ্ঞাত দুইশো টাকা পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু আজ মুহূর্ত্তের জন্য এই গণিকাকে টাকা পাঠাইবার কল্পনায় তাহার মন যেন কেন বিদ্রোহী হইতে চাহিল—কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। খাম কিনিয়া বাহির হইতে হইতে বিজয়কুমার ভাবিতেছিল—তরুবালাকে টাকা পাঠাইব, কিন্তু সেই সঙ্গে কল্যকার সেই বালিকার কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল কেন? ইহার সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধসূত্র আছে?—কৈ মিস্ বোস্, মিস্ রয়দের কথা তো মনে জাগে নাই!

চলিতে চলিতে এ চিন্তাকে ঠেলিয়া দিয়া কখন সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে সে জানে না, এমন সময় হঠাৎ অর্গানের গুরুগম্ভীর ধ্বনি-সমন্বয়ে বামা-কণ্ঠে সুমিষ্ট সঙ্গীতধারা তাহার কানে আসিয়া ঘা দিল। এ তো সে—ই কণ্ঠ! এ ধ্বনি অনেকবার কাল হইতে তাহার কানে রণিয়া রণিয়া উঠিয়াছে। বালিকার গলার আওয়াজ তাহাকে এমনি করিয়া পাইয়া বসিল বলিয়া সে কতবার আপন মনে হাসিয়া উড়াইয়াছে—এ কল্যকার জ্যোৎস্নার যাদু, এ নির্জ্জনতার যাদু, এ আলো-আঁধারে ঢাকা পাহাড়ের যাদু! চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া বিজয় দেখিল—কেয়ারীর বেড়া দেওয়া একটা কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি ছোট বাড়ী হইতে আওয়াজ আসিতেছে। বিজয় অন্যমনস্কভাবে গতি থামাইল—সে বাল্যবধি সঙ্গীতপ্রিয়। সামনে একটা বটগাছের তলায়, কি খেয়াল হইল—রুমাল পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া সে তাহার অলস কান দুটাকে উৎকর্ণ করিয়া দিল। বিজয় সঙ্গীতশাস্ত্রে ওস্তাদ না হইলেও বড়লোকী খেয়াল মাফিক ওস্তাদ রাখিয়া কিছুদিন রীতিমত সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে বুঝিতে পারিল কাল যে কণ্ঠে রবিবাবুর মিশ্র-বাউল গানের সুরে সে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সেই

কণ্ঠেই নিখুঁৎভাবে ভৈরবী আলাপ হইতেছে। বালিকা সঙ্গীতে রীতিমত অভিজ্ঞ এবং অসামান্য তাহার প্রতিভা!

ক্রমে যন্ত্রের ধ্বনি থামিল—কিন্তু বিজয় সেখানে কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিল—গানের স্বরে তাহাকে এমনই উন্মনা করিয়াছিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল মিস্ তরুবালা কেমন গায়—সে গাহিলে করতালিধ্বনিতে নাট্যগৃহ মুখরিত হইয়া ওঠে—কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় তাহার স্থান কোথায়? বিলস-লাস্যে, অঙ্গসঞ্চালনে, নয়নভঙ্গীতে যে রসের যোগান মিস্ তরুবালা দিতে সুনিপুণা তাহার বাণীর একনিষ্ঠ সাধিকা এই বালিকার কল্পনা-মূর্ত্তির সাম্‌নে লজ্জায় মাথা গুঁজিবার পথ পাইল না যে!

আবার গানের আওয়াজ ওঠে কি না বিজয় সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দেখিল একদল বালিকা কলরব করিতে করিতে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল; আর সেই কলরব-মুখরিত বালিকা যূথের মধ্যে কল্যকার সেই মেয়েটি তাহাদের সঙ্গে রাস্তায় গেটের দিকে আসিতেছে। গেট পার হইয়া সে বাহির হইতেই হাত জোড় করিয়া বিজয় তাহাকে নমস্কার করিল। মেয়েটী স্মিতমুখে তাহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এ পথে?—আপনার হাতে ব্যথা হয় তো আর নেই—না?" "না, ও সামান্য—কিছুই হয় নি, সামান্য একটু ছড়ে গিয়েছে মাত্র—মচ্‌কায়ও নি, তারি জন্য কি বাড়ীতে বসে এমন সকালটা মাটি করা যায়—ভাবলাম একটু ঘুরে আসি। তা' আপনার গানই ওখান থেকে শুন্‌তে পাচ্ছিলাম বোধ হয়!" মেয়েটি একটু রাঙিয়া মুখ নত করিল। চলিতে চলিতে বলিল, "হাঁ—এটা মেয়েদের স্কুল, আমি এদের গানের শিক্ষয়িত্রী যদিও শিক্ষয়িত্রী হবার মত জানিনে কিছুই তবু—" মুখ তুলিয়া বলিল—"বৃক্ষহীন দেশে 'এরণ্ডোঽপি ক্রমায়তে' বুঝেছেন কি না?"—বলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল। বিজয় লক্ষ্য করিল মেয়েটি হাসিলে

তাহার রক্তিমাভ গালে চমৎকার দুইটি টোল খাইয়া যায়। সে বলিল, "আপনি গান কি রকম গান তা আপনার স্বমুখে প্রশংসা করে লজ্জা দিতে চাইনে; কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যা আপনি শিখেছেন, শিখলেন কি করে!"

"আমি যা শিখেছি তা বাবার কাছে। বাবা খুব বড় ওস্তাদ, তিনি আগে ইন্দোরের রাজার সভায় গায়ক ছিলেন। বুড়ো বয়সে আর চাকরী পোষায় না ব'লে এসে এই তের বছর হ'ল এখানে আছেন। প্রথম যখন এখানে আমরা বেড়াতে আসি তখন আমি পাঁচ বছরের, সেই থেকে এক-দিনের জন্যও আমরা এ জায়গা ছাড়িনি।"

"আশ্চর্য্য! তের বছর চক্রধরপুর ছাড়েন নি? কেন আপনার বাবার দেহ কি খুব অসুস্থ?"

"না অসুস্থতা খুব বেশী নয়, তাঁর তানপুরা আব কেতাবের রাশ নিয়ে দিন একরকম কেটে যায়—কিন্তু তিনি এ জায়গা ছেড়ে এক পা নড়তে চান না কারণ আমার মা এখানে আমরা আসার দু'বছর পরেই মারা যান। বাবা বলেন তাঁর অন্য জায়গায় মন টিকবে না।" বলিয়া মেয়েটি শূন্যদৃষ্টিতে একবার খোলা মাঠটার উপরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল। বিজয় এ প্রসঙ্গ বদ্‌লাইবার জন্য একটু পরে বলিল—"আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ হল, এর অনেক আগে পরস্পর পরিচয়টা হওয়া উচিত ছিল।"

মৃদু হাসিয়া মেয়েটি মুখ তুলিয়া বলিল, "তা বটে, কিন্তু আমার পরিচয় তো এমন বিশেষ কিছু নয়—অতি সাধারণ মানুষ আমরা—আমার নাম শ্রীরমা সেনগুপ্ত—আমার বাবা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় প্রথমে ইন্দোর রাজ-কলেজের অধ্যাপক, পরে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ও সভায় একজন সুগায়ক বলে খ্যাত ছিলেন।"

একটু হাসিয়া বিজয় জবাব দিল—"তা' আপনার অতি নগণ্য লোকই

বটে; সারা জীবন স্বীয় কৃতিত্ব যিনি দশজনের চাইতে অনেক উঁচুতে মাথা রেখে কাটিয়ে গেলেন—তিনি এবং তাঁর কন্যা যিনি অল্প বয়সে—" নিজের প্রসঙ্গ হইতেই অত্যধিক কুণ্ঠার সঙ্গে ও অসামান্য সরলতার সঙ্গে রমা উত্তর দিল—"কিন্তু আমরা গরীব, দুনিয়ায় পয়সা না থাক্‌লে মনুষ্যত্বে হীনতা না থাকলেও খ্যাতিতে হীনতা স্বীকার করতেই তো হবে। আমায় এই চাকুরী করতে হয় ব'লে বাবা কত দুঃখ করেন।"

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বিজয় বলিল—"কিন্তু আপনার বাবা তো বেশ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন—"

"তা ছিলেন বটে। কিন্তু সামান্য কি কারণে রাজার সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে এখানে চলে আসার কিছু পর মা'র যখন অসুখ হ'ল তখন তাঁর চিকিৎসাতেই সামান্য কিছু পুঁজি যা' ছিল তা শেষ হয়। বাবা তাঁর চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নি—কলকাতা থেকে ডাক্তার নীলরতনকে পর্য্যন্ত এনেছিলেন—কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রাখতে পারলেন না।"

রমা ও বিজয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর রমাই পুনরায় বলিল—"অনাবশ্যক কথা আমি তো কতই বল্লাম, কিন্তু আপনি তো পরিচয় দিলেন খুব।"

বিজয় কহিল, "আমি আপনাদের চক্রধরপুরের মিসেস্ মনোরমা সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। হয়ত তাঁকে আপনারা চেনেন?"

"নামে অবশ্য চিনি। তাঁরা তো মস্ত জমীদার। তবে বাবা ইদানীং কারুর সঙ্গে বড় একটা মেশেন না ব'লে ঘনিষ্ঠতা তেমন নেই।"

"আর আমার নিজের বেশী পরিচয় কি দেব? আপনার বাবার মত আমার বাবা এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। আর আমি—আমি বোধ হয় দুনিয়ায় সব চাইতে অকেজো এবং লক্ষীছাড়া লোক—" তাহার

কণ্ঠস্বরে সত্যবাদিতার সুরের সঙ্গে এমন একটা অনুশোচনা-পূর্ণ হতাশা ধ্বনিত হইল যে বিজয় নিজেই তাহাতে চমকিয়া উঠিল। একটু আশ্চর্য্যের সহিত রমা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনারা নিশ্চয়ই খুব বড়লোক—আপনাদের তো :আমাদের মতো হাত পা খাটিয়ে খাবার দরকার নেই, তাই বোধ হয় অতিরিক্ত বিনয়ে একথা বল্‌ছেন।" বিজয় বুঝিয়াছিল তাহার বহুমূল্য সাজসজ্জা মেয়েটীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেই :মুহূর্ত্তে হঠাৎ তাহার মনে হইল সে যদি ইহাদেরই মত দরিদ্র হইত তাহার বিন্দুমাত্র তাহাতে আপত্তি ছিল না। সে কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রমার মুখের দিকে চাহিল; পরে কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিল, "আমি আপনাদের মতই গরীব, তবে বড়লোক পিসির বাড়ীতে আছি এই যা। পিসিমা আমায় খুবই ভালবাসেন।" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মনে হইল এ মিথ্যা কথাটা সে বলিল কেন?—কিন্তু যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহা তো ফিরাইবার উপায় নাই। কিন্তু নাই কি? একবার ইচ্ছা হইল কথাটা ফিরাইয়া সত্য কথা বলে; কিন্তু সঙ্কোচের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পরমুহূর্ত্তে ভাবিল—ইহাকে সব কথা বলিয়া লাভ কি? চক্রধরপুরে আমি কয়দিন—দু'দিন পরেই তো এ স্থান ছাড়িব—হয়তো ইহার সঙ্গে জীবনে আর দেখাও হইবে না।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে শুধু বেড়াতেই বোধ হয় আপনি এসেছেন?"

"না—হ্যাঁ তা' বৈকি?"

রমা বিজয়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিল, "আপনার স্বাস্থ্য হয় তো খুব ভালো নয় এখন—কিছুদিন বেশী থাকলে আপনার উপকার হ'তে পারে।"

বিজয় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "কিসে বুঝলেন আমার শরীর ভালো নয়? আমি তো ক্ষীণদেহ নই।"

"বাবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষ—তাঁরি কাছে—'শিখেছি' বল্লে ঠিক হবে না—হোমিওপ্যাথি আমায় কিছু শিখতে হয়েছে। মহারাজার সঙ্গে একবার ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে বাবা কোন্ হোমিওপ্যাথ আমেরিকান ডাক্তারের একটি বিশেষ ভক্ত শিষ্য হ'য়ে দেশে ফেরেন। যাক্ সে কথা; কিন্তু আপনি কি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন—আমার কিন্তু প্রথমটায় এতে যেমন অবিশ্বাস ছিল, তেমনি পড়তে বিরক্ত লাগত।"

বিজয়ের হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস খুব বেশী ছিল না; কিন্তু অম্লানবদনে চট্ করিয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ খুব করি, কিন্তু আশ্চর্য্য লোক আপনার বাবা—আর আপনিও।" দীপ্ত চক্ষে রমা জবাব দিল, "সত্যিই বাবা অসাধারণ লোক। তাঁর প্রতিভা যেদিকে যে বিষয় আয়ত্ত করতে চায়—এত সহজে তা' করে যে আশ্চর্য্য। আর আমি হচ্ছি একটী নিরেট বোকা। গণিতে আমি যে কি পণ্ডিত তা' যদি জান্‌তেন! একবার তো I. A. পরীক্ষায় গণিতে ফেলই হয়ে গেলুম। বাবা না থাকলে পাশ করা জন্মযুগে আমার সাধ্য ছিল না!" বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিজয় নতমুখে চিন্তা করিতে করিতে চলিতেছিল যে মেয়েটী অসাধারণ পিতার কন্যার অপেক্ষা নিজেই হয় তো বেশী অসাধারণ।

একটু পরে রমাই ফের সুরু করিল—"কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে কথা বল্লাম তা ঠিক নয় কি?" একটু হাসিয়া বলিল, "মনে করবেন না নিজের চিকিৎসা বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাবার জন্য একথা বল্‌ছি—আমি জিজ্ঞাসা করছি এই বলে যে এই নূতন শেখা বিদ্যায় সত্যি সত্যি একটু অধিকার হচ্ছে কিনা। আপনার শরীর বেশ জোয়ান দেখালেও আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—জানেন তো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

শুধু লক্ষণ দেখে তারই উপর চলে—" তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া বিজয় বলিল, "আপনার অনুমান যথার্থ,—আমার স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকে ভালো নেই—কিন্তু কারণ বুঝতে পাচ্ছি না।" সে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল এ অসুস্থতার কারণও মেয়েটি কিছু আন্দাজ করিবে কিনা।

রমা বলিল, "এখানে চেঞ্জ ছাড়া যদি ডাক্তার দেখাতেও চান তবে মিষ্টার বোরকারকে দেখাতে পারেন। বাবা বলেন, এখানে তিনি বেশ ভালো হোমিওপ্যাথ—"

এমন সময় একটা দশ বারো বছরের ময়লা কাপড় পরা কালো ছোকরা তাহাদের দিকে আসিতেছিল। রমাকে দেখিয়া ছেলেটি শাদা দাঁতের পাটি বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। সে নিকটে আসিলে তাহার গালে একটা সস্নেহে টোকা মারিয়া বলিল, "লছমন্, তুম্‌হারী মাইজীকী তবিয়ৎ আচ্ছী হ্যায় ?"

বালক উত্তর করিল—"জী। লেকিন দাওয়া যো হ্যায় আজ খতম হো যায়গা। দাওয়াকে লিয়ে সামকা বখত আপকা মোকান্‌মে যাউঙ্গা ক্যা ?"

"আ যানা"—বলিয়া রমা অগ্রসর হইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "এর মাকে আপনি চিকিৎসা কচ্ছেন বুঝি ?"

রমা উত্তর দিল, "চিকিৎসার আমি কি জানি ? তবে এরা বড্ড গরীব—ডাক্তারের পয়সা পাবে কোথায় ? তাই বাধ্য হয়ে ওষুধ চাইলে দিতে হয়—কারণ হোমিওপ্যাথিতে ভালো না হ'লেও সাধারণত খারাপ কখনো হয় না। আমি যতটা সম্ভব নাই-মামার স্থানে কাণা-মামার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু এই যে আপনাদের বাড়ী এসে পড়েছি। আচ্ছা আসুন তবে, নমস্কার।"

"আচ্ছা চলুন না, আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে হয় তো আপনার আপত্তি হবে না—"

"বিলক্ষণ আপত্তি হবে। রোদ বেশ চড়ে উঠেছে আর আপনার শরীর ভালো নয়; আপনার এ অনাবশ্যক ভদ্রতা দেখাবার কোনোই প্রয়োজন দেখি না।"

এ কথার পর ইচ্ছা সত্ত্বেও বিজয় আর অগ্রসর হইল না, বলিল, "বিকেলবেলা বেড়াতে বেরুবেন কি? সে সময় সাক্ষাৎ হলে খুসী হ'তাম—" কথাটা হঠাৎ বলিয়া কি রকম খাপছাড়া মনে হওয়াতে সে তাড়াতাড়ি একটা কৈফিয়ৎ জোগাড় করিয়া বলিল, "এই নির্ব্বান্ধব দেশে এ পর্য্যন্ত নতুন লোকের মধ্যে আলাপ তো হয়েছে শুধু আপনার সঙ্গে; তা ছাড়া আপনার মুখে আপনার অদ্ভুতকর্ম্মা পিতৃদেবের গল্প শুনে তাঁকে একবার দেখবার ইচ্ছাও যে আমার খুবই হয়েছে তা' আপনার কাছে গোপন করবার আমি কোন কারণ দেখি না—তাই—"

"ওঃ—তা এখানে কিছুদিন আপনি থাক্‌লে আমাদের সঙ্গে আপনার দেখাশুনা অবশ্যই হাত পারবে। তবে আজ বিকেলে হয়তো আমি—'হয়তো' কেন নিশ্চয়ই কাজে আট্‌কা থাক্‌বো। আচ্ছা আসি তাহলে, নমস্কার!" বলিয়া যুক্তকর ললাটে স্পৃষ্ট করিয়া সে অগ্রসর হইল।

বিজয় কিয়ৎক্ষণ তাহার নাতিদূরস্থ মন্থরগতির পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজের অজ্ঞাতে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় একরাশি চিন্তার বোঝা লইয়া বাড়ীর গেটে ঢুকিল।

৪

সেদিন বৈকালে বাহির হইয়া সত্যই রমার সহিত বিজয়ের সাক্ষাৎ হইল না। অথচ এই মেয়েটির চিন্তা যে তাহাকে এমনি করিয়া পাইয়া বসিয়াছে ইহাতে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাহার বহুমুখী প্রতিভা, উগ্র সাহস, পবিত্রতামণ্ডিত দেহসুষমা, সবার উপর মেয়েটির নিঃসঙ্কোচ নির্বিকার সহাস্য ভাব তাহাকে এমন একটা নূতনত্বের আভাস দিয়াছিল যাহা মিস্ রয়, মিত্র, বসুদের মধ্যে মোটে ছিল না। তাহাদের সাম্‌নে আছাড় খাইয়া হাত মচকাইলে এমন ত্রস্ত সাহায্য দেওয়া দূরে থাক্—তাহারা হয়ত ফিট্ হইবার জোগাড় হইত; তাহার মনে হইল, সে সাক্ষাতের জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলে মিস্ রয়েরা হাতে চাঁদ পাইত অথচ এই মেয়েটির কোনোই ভাবান্তর সে লক্ষ্য করে নাই। একবার সে ভাবিল সে নিজেকে সত্যই লক্ষপতি বলিয়া পরিচয় দিলে মেয়েটির ভাবান্তর হইত কি না! পরক্ষণেই সে চিন্তাধারাকে সংযত করিয়া স্থির করিল তাহা হইলে বরং উল্টা ফল হইবারই সম্ভাবনা ছিল—এ সরল পবিত্রতা টাকার স্তূপের কাছে মাথা নোওয়ায় না।···কিন্তু তাই বলিয়া সে কি এই নিঃস্ব বৃদ্ধ-তনয়া দু'-দিনের-চেনা পাহাড়ী মেয়েটার কাছে বাঁধা পড়িবে নাকি? সে নিজের উপর রাগ করিয়া আত্মাভিমানে পরের দুই দিন বাসার বাহির হইল না—পিসিমার সঙ্গে ছাই-পাঁশ বকিয়া কাটাইয়া দিল।

তৃতীয় দিন বৈকালে মিস্ তরুবালাকে প্রতিজ্ঞাত দুইশো টাকা ইনসিওর করিয়া সে ডাকঘর হইতে ফিরিতেছিল—সহসা দেখিল দ্রুত-পদক্ষেপে রমা রাস্তা ধরিয়া তাহারই পানে আসিতেছে। কুকর্ম্ম করিয়া ধরা পড়িলে লোকের যে অবস্থা হয়, রমাকে এ সময় হঠাৎ সাম্‌নে দেখিয়া

তাহার তেমনি অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। সে যেন পাশ কাটাইয়া মুখ লুকাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত—কিন্তু রমার সঙ্গে চোখোচোখি না হইয়া জো ছিল না।

রমা মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—"এত সকালেই রোদ না পড়্‌তে বেরিয়েছেন যে!"

প্রত্যুত্তরে শুষ্ক একটু হাসি ঠোঁটের কোণায় টানিয়া নতমুখে বিজয় বলিল, "ডাকঘরে একটু কাজ ছিল—"

"বাড়ী ফিরছেন?"

"তাই ভাবছিলাম—যে কোথায় যাওয়া যায়।—কিন্তু আপনিও তো রোদ থাক্‌তে বেরিয়েছেন।"

"আমার এখনো দেড় মাইল পথ যেতে হবে তারপর দু'ঘণ্টা ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে আবার সন্ধ্যা নাগাত বাড়ী ফিরতে হবে।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে বিজয় প্রশ্ন করিল, "পড়াতে যাচ্ছেন?—কাকে? কোথায়?"

"শহরতলীর পাশের গাঁ-টাতে বাবার চেষ্টায় একটা ফ্রী স্কুল হয়েছে; সেখানে একদিন অন্তর আমি পড়িয়ে আসি—রেলওয়ে মজুরদের ছেলে-পিলেরা আর দু' একটা এদেশী ছেলেমেয়েও পড়ে—"

"আর একদিন ক'রে স্কুলে ছুটি থাকে নাকি?"

"অগত্যা—আমি রোজ সময় করে যেতে পারিনে—আর এতদূর রোজ যাওয়াও মুস্কিল। একটা মাইনে করা **tutor** রাখতে পারলে বেশ হয়, কিন্তু টাকা কৈ? ছেলে ঝেঁটিয়ে আনবার জন্য একটা বেয়ারা আছে তার মাইনে আমরা কোনমতে জোগাই।—আচ্ছা আসি তবে।"

বিজয় তাড়াতাড়ি কহিল, "একজন ওদের ক্লাশ চালাতে পারে এমন টিউটরের কত মাইনে হলে হয় ?"

সচল পদ সংযত করিয়া রমা উত্তর দিল, "টাকা দশেক হ'লেই কাজ-চলা গোছ হয়, তারপর আমি তো আছিই।"

"আচ্ছা আমি যদি এ টাকাটা দি—মানে—পিসিমাকে দিয়ে এ টাকাটা যদি আপনার স্কুলে আমি দিইয়ে দিতে পারি তবে সে প্রস্তাব কি আপনি অনুমোদন করেন ?"

স্মিতহাস্যে কৃতজ্ঞতাপূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রমা কহিল—"সত্যি বল্‌ছেন ? —এতে আমার অনুমোদন না করবার কি থাক্‌তে পারে ? সৎকাজে আপনার পিসিমা টাকা দেবেন তাতে আমার অদ্ভুত আপত্তি থাকলেও গ্রাহ্য বা হবে কেন ?"

"বেশ তা'হলে দয়া করে আপনার স্কুল আমায় আজ একবার দেখিয়ে আন্‌তে অনুরোধ করতে পারি কি ?"

"বেশ তো চলুন না"—বলিয়া হাসিয়া রমা আবার পা বাড়াইল।

বিজয় সেদিন যাহা দেখিয়া ফিরিল তাহার চিন্তা সে শীঘ্র এড়াইতে পারিল না। ছেলেমেয়েগুলা রমাকে কি যে ভালোবাসে, রমাই বা সেই অর্দ্ধনগ্ন কৃষ্ণকায় শিশুগুলাকে কেমন আপনার করিয়া ভাবে, কি তাহার পড়িবার ভঙ্গী, পড়াইবার ভঙ্গী, সামান্য খাতাপত্র যা কিছু আছে কি পরিষ্কার সজ্জিত, সুছাঁদে লেখা ; স্কুলের ঘরখানি অসংস্কৃত হইলেও কেমন পরিচ্ছন্ন সেটুকু দৃষ্টি এড়ায় না—রমার স্পর্শে সত্যই সমস্ত যেন শ্রীতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

স্কুল দেখাইয়া রমা বিজয়কে বলিয়াছিল, "আপনি তাহলে আসুন গিয়ে, দু'ঘণ্টা ছেলেদের নিয়েই আমায় থাকৃতে হবে—আপনার একা একা বিরক্ত ধরে যাবে এখন।"

বিজয় কিন্তু যায় নাই এবং আজ জীবনে প্রথমবার সাশ্চর্য্যে অনুভব করিয়াছে bla ব্লে cla ক্লে পড়ানো দুই ঘণ্টা ধরিয়া শুনিবার ধৈর্য্য সে কেমন করিয়া কবে অর্জ্জন করিয়াছে!

আশ্চর্য্য মেয়ে এই রমা! তাহার মত লোহাকেও এ বালিকা সোনা করিয়া তুলিতে পারিবার ক্ষমতা রাখে কি? এ এত কাজ করে কিন্তু নিজকে কি চমৎকার ভুলিয়া আছে। সাধারণ মানুষের আহার-নিদ্রার মত এত কাজ এ বালিকার দৈনন্দিন অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তাহার গুরুভার একটুও তাহার বোধ নাই।

৫

সেদিন রমা বাড়ীতে ফিরিয়া সর্ব্বাগ্রে বাবাকে এই শুভসংবাদ দিল —"বাবা, আমাদের ফ্রী স্কুলের একজন শিক্ষকের বেতন আজকে জোগাড় হল।"

"কি করে মা? চক্রধরপুরে কে এমন দাতা এলো রে যাকে আমার আগে তুই পাকৃড়াও করলি পাগ্‌লি।"

"মিসেস্ মনোরমা সরকার ওটা দেবেন—মানে তাঁর এক ভাইপো এখানে এসেছেন; তিনি বল্লেন তাঁর পিসিমাকে দিয়ে ওটা করিয়ে দেওয়াবেন। তাঁর পিসিমা তাঁকে খু-ব ভালোবাসেন কিনা।"

"ভাইপোটী কে মা?"

"তাঁর নাম হচ্ছে—" বলিয়া রমা থামিয়া গেল—নাম বলিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল ভদ্রলোকটী পরিচয় দিতে গিয়া মিসেস্ মনোরমার

ভাইপো বলিয়াই পরিচয় দিয়াছে—নাম বলে নাই। সেও যে মূর্খের মতো পরে আর জিজ্ঞাসা করে নাই ইহা মনে করিয়া সে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু চট্ করিয়া একজন পূর্ব্ব অপরিচিত আগন্তুকের সহিত সে তাহার পিতার অজ্ঞাতে এতটা ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে—এই নাম-না জানা ব্যাপারে তাহার কতকটা আব্রু সৃষ্টি করিল—দেখিয়া সে যেন একটু মনে মনে খুসীই হইল।

"তাঁর নাম তো জিজ্ঞাসা করিনি বাবা—"

প্রচুর হাস্য করিয়া রমার পিতা কহিলেন, "বাঃ—খাসা আমার মেয়ে—স্কুলের শিক্ষকের বেতনের বন্দোবস্ত ক'রে এলেন কিন্তু দাতার নামই জানা নেই। যাক্, তা তিনি কি করেন ?"

"তা-ও জিজ্ঞাসা করিনি বাবা। একে অসুস্থ মানুষ, তার ওপর—" তার ওপর আর কি বলা হইল না—

"সেদিন রাস্তার খাদে পড়ে' গিয়েছিলেন, ধ'রে তুল্‌তে যেতে আলাপ হোলো।"

"কি রকম ?" রমা সব একে একে খুলিয়া বলিলে বৃদ্ধ মিসেস মনোরমার ভাইপোর কথা মূলতুবী রাখিয়া বলিলেন, "একটু চা কর মা—"

রমা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ না করিয়া কহিল, "বাবা, এই ভদ্রলোককে একদিন চা খেতে নিমন্ত্রণ করলে হয় না—তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতেও চান—"

"তা বেশ তো মা—দু'জনে বসে মাঝে মাঝে বেশ গল্প গাছা করা যাবে—" রমার কথার ধাঁচে বৃদ্ধের কেমন মনে হইতেছিল—ভদ্রলোক তাঁহারই মত বৃদ্ধ না হৌন অন্ততঃ প্রৌঢ়বয়স্ক হইবেনই—নয় ত খানায় খন্দে আছাড় খান।

রমা ঠিক করিয়া রাখিল পরদিনই ভদ্রলোকটীকে নিমন্ত্রণ করিবে—

আরও বিশেষ করিয়া মনে রাখিল, এবার সাক্ষাতের প্রথমেই তাহার নাম জানিয়া লইবে। তাই ত নামটাই তাহার সে এখনো জানে না।

পরদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া সাক্ষাৎ হইতেই রমা বিজয়কে নিমন্ত্রণ করিল—"আজই—আজই সন্ধ্যায় বাবাকে বলে রেখেছি—আপনার বিশেষ কোন কাজ নেই তো ?"

"নাঃ আমার আবার কাজ কি ?—আমি তো একটী বিরাট্ নিস্কর্ম্মা—" উভয়ে কথোপকথন হইতেছে এমন সময় ডাক পিয়ন একখানা চিঠি ও একটা পাতলা প্যাকেট রাস্তায় হঠাৎ বিজয়ের সহিত দেখা হওয়ায় তাহার হাতে দিয়া মন্থর গতিতে অদৃশ্য হইল। চিঠিখানা বিজয়ের পিসিমার, সেখানা সে পকেটে ফেলিয়া তাহার নামীয় প্যাকেটটা ত্রস্ত ঔৎসুক্যে খুলিয়া ফেলিল।

প্যাকেটটা যতক্ষণ বিজয় খুলিতেছিল রমা পার্শ্বেলের উপরের শিরোনামাটা মনে মনে পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "সত্যি বিজয়বাবু, কাল কি জব্দটাই হয়েছি বাবার কাছে আপনার নাম বল্‌তে না পেরে, তা তো আপনাকে প্রথমেই বলেছি—কিন্তু আমি এম্‌নি বোকা—ওকি ! কি হ'ল ?

প্যাকেট খুলিয়া যে বস্তুটী বাহির হইয়াছিল, তাহারই পানে তাকাইয়া বিজয়ের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। সেখানা একখানি ফটোগ্রাফ—ছবি মিস্ তরুবালার। সে বিজয়ের অনুজ্ঞা মত চিঠি লেখে নাই, শুধু কি খেয়ালে—হয়তো নূতন এ ছবিখানা তুলিয়াছে বলিয়া—এক কপি বিজয়কে বুকপোষ্ট করিয়া পাঠাইয়াছে। কিন্তু রমার সাম্‌নে এ ছবি !—সে এর কি কৈফিয়ৎ দিবে ? সে উত্তেজনায় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় মুহূর্ত্তে ঘামিয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসিত হইয়া একটু হাসিয়া উত্তর দিল—"নাঃ এমন কিছুই নয়,—দেখতেই পাচ্ছেন এ একখানা ফটোগ্রাফ।

এ আমার এক মরা বোনের ছবি, তাই হঠাৎ দেখে একটু কেমন লাগছিল—" বলিয়া ফটোখানা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিল। রমা তাহার আয়ত কৃষ্ণচক্ষু সহানুভূতিতে ভরিয়া তাহার প্রতি একবার তাকাইয়া সেখানা হাতে লইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "ইনি কি সুন্দর দেখতে! কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে এঁর মোটেই সাদৃশ্য নেই—"

"তা নেই বটে!"

"চমৎকার সুন্দরী।"

"আর আমি হচ্ছি তার উল্টো—তা সাদৃশ্য থাকবে কি ক'রে বলুন?" এতক্ষণে বিজয় বেশ:সামলাইয়া লইয়াছিল।

রমা বিন্দুমাত্র লজ্জা না করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে বলিল—"কেন, আপনি তো বেশ ভালো দেখ্‌তে—"

"কিন্তু আপনার পাশে আমাকে কেউ দেখ্‌লে ঠিক বল্‌বে **The beauty and the beast!"** বলিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

রমা এইরূপভাবে তাহার নিজের প্রসঙ্গ আনাতে একটু বিরক্ত তিক্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কথায় অতিশয়োক্তিটা বাদ দিয়ে বলাই ভালো—আমিও **beauty** নই আপনিও **beast** ন'ন, এ আপনি বেশ বুঝ্‌তে পারেন।"

বিজয় একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল। সে যে সমাজে চলাফেরা করে সেখানে এ রকম প্রশংসাবাণী বিশেষ দোষাবহ বলিয়া ধরা হয় না—কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অনভ্যস্তা এ বালিকার তাহা পছন্দ হয় নাই। তথাপি কথাটাকে তরল করিয়া লইবার জন্য সে বলিল "কেন—আপনি কি দেখ্‌তে কুৎসিত?"

কিছুমাত্র বিনয় না প্রকাশ করিয়া রমা বলিল—"কুৎসিত লোকে আমায় বলে না বটে, কিন্তু কি রকম আমি দেখ্‌তে সেটা আমি নিঃসংশয়ে আপনার চাইতে ভালো জানি—যাক্ একথা যেতে দিন" বলিয়া

ফোটোখানা বিজয়ের হাতে দিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—"সত্যি আমিই বরং beast, একটু হলেই আপনার সঙ্গে ঝগড়া স্বরু করেছিলাম আর কি—অথচ আজ আপনি আমার অতিথি। চলুন সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, বাবা হয়তো আমাদের পথ চেয়ে আছেন।"

বিজয় হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, "চলুন" এবং চলিতে আরম্ভ করিয়া ছবিখানাকে কোর্টের ভিতর দিককার পকেটে ভরিয়া রাখিল।

৬

বিজয় সে রাত্রে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বুঝিল যে নিঃসংশয়ে তাহার জীবনে একটা প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে! বহু নারীর সংস্পর্শে সে আসিয়াছে কিন্তু কাহারো চিন্তা তো অহোরাত্র এমন করিয়া তাহাকে পাইয়া বসে নাই; কাহারো সান্নিধ্যে এমন করিয়া তাহার চুলের গোড়া হইতে আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত তো তড়িৎপ্রবাহ ছাড়িয়া বেড়ায় নাই; সবার উপর আর কোনো স্বন্দরীর নিকট এত অনুপযুক্ত নিজেকে মনে হয় নাই—আজ মনে হইতেছিল সে যেন ইহার চরণধূলিরও যোগ্য নহে। সে কি এ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবার যোগ্য? তাহার অন্তরাত্মা হইতে হতাশার ধ্বনি উঠিল, না—না। তবে কেন সে এ মরীচিকার পিছে ঘুরিয়া মরে? যে নির্লজ্জ জীবন সে এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছে—তাই তাহার একমাত্র অবলম্বন, তার বেড়াজাল কাটাইয়া উঠিতে পারিবে কি? আর উঠিলেই সে কি এই পূজার নির্ম্মাল্য মাথায় তুলিবার যোগ্যতা অর্জন করিবে? আজ প্রথম তাহার অতীত জীবন একটা বিকট অভিশাপের মত মনে হইল;

বুঝিতে পারিল কিসের ছোঁয়া তাহার আজ লাগিয়াছে যাহার জন্য কৃত্রিম তরল হাস্যলাস্য তাহাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে; দুনিয়ার যে নানান্ কাজে সে মাত্র টাকা বিলাইয়াই ক্ষান্ত ছিল—আজ দেখিল সেখানে টাকার মূল্য অতি কম, আত্মনিয়োগের মূল্য কত বেশী। কৈ কলিকাতায় তো তাহার পয়সায় অমন দশটা স্কুল চলিতেছে কিন্তু এমন পরিপাটি কাজটী কোথায় হয়?—এখানে তো কত অভাব, কিন্তু সেখানে মাসের শেষে মাহিনা গুনিবাও দারোয়ান আসে তো মাষ্টার আসে না—মাষ্টার আসে তো দারোয়ান আসে না। মাষ্টার আসিলেন, টেবিলে পা তুলিয়া ঘণ্টা দুই ঘুমাইলেন, ছাত্ররা আসিল তো পঞ্চাশ জনার মধ্যে দশ জন আসিল—তাও শুদ্ধ গুরুমশাইর বেত্রখানির ভয়ে। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশের বেত খাইতে খাইতে তাহার বিভীষিকাও চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিজন যেন প্রথম বুঝিতেছিল—করুণা করিয়া গরীবের উপকার করা যায় না;—তাহাদের প্রাণে প্রাণ মিশাইতে হয়। তাহার মনে হইতেছিল রমার ঔষধের বাক্সটী বহিয়া যদি সে দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত তবে যেন সে কৃতার্থ হইয়া যাইত। রমার পিতার সঙ্গে এই যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সে ব্যাবিলোনের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিয়া আসিল। বৃদ্ধের সঙ্গে এ নীরস আলাপ সে এতক্ষণ ধরিয়া কি করিয়া করিতে পারিত? অথচ পরীক্ষার পড়ার পর হইতে ইতিহাসের পাতা তাহার কাছে কি উৎকট বিরক্তির সৃষ্টি করে তাহা সে নিজেই মাত্র জানিত। তাহার মনে পড়িল জোড় হাতের উপর চিবুক রাখিয়া রমা কি উৎসুকভাবে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। মেয়েটার কি তীব্র অনুসন্ধিৎসা। বি-এর বেলা বিলাতে সে ইতিহাস পড়িয়াছিল এবং যদিও বৃদ্ধের জ্ঞান অতি গভীর তবু সেও যে দু'চারটা প্রয়োজনীয় নূতন কথা না বলিতে পারিতেছিল তা নয়,—তখন সে লক্ষ্য করিয়াছিল

রমার চোখ তাহার পানে চাহিয়া কি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল! এ সহানুভূতি কি পরিশেষে অন্য কিছুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না?—সে সৌভাগ্য তাহার হইবে কি?— না না, সেটা তাহার দুর্ভাগা জীবনে আর একটা দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। এ পবিত্র জীবন তাহার পঙ্কিল জীবনের সংস্পর্শে আনিয়া সে আর একটা পাপ করিতে পারিবে না। তাহার মতে আর রমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না করাই উচিত? এখান হইতে সে এ সম্বন্ধে তীব্র দৃষ্টি রাখিযাই চলিবে···কিন্তু কেন, সে দুদিনের জন্য বই তো আসে নাই, এ অমূল্য আনন্দটুকু সে কেন ছাড়িবে?—এ দেব-বালিকা তাহার ভিতরে এমন কি আছে যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে! এ তো শুধু দু'দিনের পরিচয়, তারপর ভবিষ্যতের স্রোতে কে কোথায় ভাসিয়া যাইবে ঠিক কি! কিন্তু দু'দিনের হইলেও তাহার অমূল্য লাভ সে ছাড়ে কেন! হায়রে তাহার কুৎসিত অতীত জীবন চুরুট ধরাইবার জন্য দেশলাই খুঁজিতে কোটের ভিতরের পকেটে মিস্ তরুবালার নবপ্রেরিত প্রীতি উপহারখানি তাহার হাতে ঠেকিল। হঠাৎ একবার তাহার ইচ্ছা হইল ছবিখানা টুকরা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, কিন্তু একটু পরে নিজের অসহিষ্ণুতায় মৃদু হাসিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল, "Damn it।" ছিঁড়িল না।

বৃদ্ধ আর একটু হইলেই তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! সে নিজে একজন দালাল বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু নাম বলিতেই বৃদ্ধ অঙুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলেন, "বিজয়— বিজয়কুমার দত্ত—আমি একজনকে চোখে না দেখে থাকলেও ঐ নামে জান্‌তাম। প্রকাশবাবু জমিদার—শ্রীযুক্ত প্রকাশ দত্তের ছেলে—ইতিহাসে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স নিয়ে অক্সফোর্ড থেকে ফেরে। প্রকাশবাবু মরার পরে ছেলেটা শুনেছি খারাপ হয়ে গেছে—" বিজয় ততক্ষণ প্রবল বেগে ঘামিতেছিল! আজ কাহার মুখ দেখিয়া সে বাড়ীর বাহির হইতে পা বাড়াইয়াছিল!···

প্রকৃত পরিচয় দিলে আজই সে এ গৃহ হইতে নির্বাসিত হইত হয়তো!··· আসিবার সময় বৃদ্ধ তাহাকে মাঝে মাঝে আসিতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন,"রমার কথায় আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাদের প্রায় সমবয়সীই বা হবে—দুদণ্ড কথা কয়ে বাঁচ্‌ব! কিন্তু তবু তুমি এসো—তোমার সঙ্গে গল্প করে বাঁচ্‌ব! তোমার সঙ্গে গল্প করে ভারী খুসী হয়েছি—"

রমা কৃত্রিম কোপের সঙ্গে পিতার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা, তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা—আমি তোমায় বলেছিলাম—বিজয়বাবুর ইয়া গালপাট্টা, পাকা দাড়ী—হাতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, দাঁত পড়েছে, কুঁজো হয়েছেন—এই সব না।"

উচ্চস্বরে হাস্য করিতে করিতে বৃদ্ধ পরম স্নেহে কন্যার মাথাটা বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ঘাট হয়েছে আমার মা—অমন কথা তুমি কস্মিন্‌কালেও বল নি। বুঝলে বিজয়, মা-টী আমার, আমার কথায় খুঁৎ ধরতে পারলে আর ছাড়বে না, সব সময়েই তার বুড়ো ছেলের ভুল ধরে বেড়াবে।" বুক হইতে মাথা না সরাইয়া চোখ বাপের মুখে পাতিয়া রমা বলিল, "হাঁ, তা-ই বৈকি।"

গৃহের দিকে পদচালনা করিতে করিতে বিজয় ভাবিতেছিল, "যেমন বাপ তেমন মেয়ে—মধুর—বাস্তবিকই মধুর।" অজানিতে সে একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

৭

দশ বারো দিন পরে একদিন কথায় কথায় রমা বলিল, "আপনার চেহারা কিন্তু এই পনেরো দিনের মধ্যে আশ্চর্য্য সেরে উঠেছে! জায়গার গুণ দেখুন" গম্ভীর-ভাবে বিজয় উত্তর করি—"সেটা জায়গারই একমাত্র গুণ কি না বলা চলে না।"

সে এখানে আসিয়া অবধি মদ ছোঁয় নাই, ব্যসনে রাত জাগে নাই, দুই বেলা মুক্ত হাওয়ায় পরিশ্রম করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে—সবার উপর সে ভালোবাসিয়াছে—জীবনে প্রথমবার তাহার সমস্ত দেহ মন দিয়া ভালো-বাসিয়াছে। এ সমস্তেরই ছাপ তাহার চেহারায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

রমা বলিল, "জায়গারই গুণ বৈকি! আরও কিছুদিন বেশী এখানে থাকলে আপনি পালোয়ান হ'য়ে ফিরতে পারবেন।"

"আমি তো ছ'সাত দিনের ভেতরই ক'লকাতা যাচ্ছি"—বিজয়ের ষ্টেটের ম্যানেজার ষ্টেট্ সংক্রান্ত কি একটা ব্যাপারের জন্য ইদানীং কলিকাতা ফিরিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ পত্র দিতেছিল। তাহার যদিও অত শীঘ্র যাইবার মতলব ছিল না, তবু কি মনে করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে রমার মুখের দিকে চাহিল।

"ছ' সাত দিনের মধ্যেই চলে যাবেন?"—

হ্যাঁ—সত্যি।" বিজয়ের মনে হইল শব্দটি উচ্চারণ করিতে রমার গলাটা বুঝি একটু কাঁপিয়া গেল। পরক্ষণেই মনে হইল সে তাহার কল্পনা মাত্র। সে উত্তর দিল, "আপনার কাছে মিথ্যা বলে আমার লাভ? কিন্তু—আপনার শরীর তো এখনও সম্পূর্ণ সারে নি!"—

"কিন্তু কাজ তো আমার সুবিধা অসুবিধা দেখবে না"—

"তা-ও বটে, আপনারা পুরুষ মানুষ—কত কাজ আপনাদের—"

একটু থামিয়া পরে আবার হঠাৎ বলিল, "চলে যাচ্ছেন তো—কাল আপনাকে একটা জিনিষ দেখিয়ে আন্‌ল। ঐ পাহাড়টার আড়ালে কিছু দূরে একটা হ্রদের মতো আছে, জায়গাটা ভারী চমৎকার—যাবেন ?"

•এ ভাবে রমা তাহাকে কোনো দিন নিমন্ত্রণ করে নাই। বিজয় খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল—"যাবো না—নিশ্চয় যাবো—এতে আবার আমার আপত্তি হবে ?"

রমা কহিল "তবে বাবাকে কাল বলে বৈজুকে সঙ্গে করে আমি এখানে আপনার জন্য সাড়ে চারটায় অপেক্ষা করব।—কেমন ?"—

"আচ্ছা"—

বৈজু রমাদের পুরাতন ভৃত্য। সে তাহাদের সঙ্গী হইবে এ কল্পনা সে এতক্ষণ করে নাই—তাহাদের ভ্রমণে তাহার উপস্থিত কল্পনা করিয়া সে যে একটু ক্ষুণ্ণ হইল একথা সত্য হইলেও মনে মনে স্বীকার করিতে চাহিল না।

ইতোমধ্যে বিজয় রমার পিতার সঙ্গে প্রায় রোজই কিছুক্ষণ গল্প করিয়া আসিত বলিয়া তিনি বিজয়ের উপর ভারী খুসী হইয়াছিলেন। বিজয়ের স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে চিত্ত-রঞ্জন করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি এই ভ্রমণের প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। বিজয় পূর্ব্বের কথামত সাড়ে চারটার সময় রমার সহিত মাঠে একত্র না হইয়া চারটার সময় রমাদের বাসায় হাজির হইয়াছিল। তাহার পানে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "অন্ধকার না হ'তে ওখান থেকে রওনা হ'য়ো, নইলে পৌছাতে বেশী রাত হ'য়ে যাবে।"

রমা রওনা হইবার ব্যস্ততায় কহিল, "তোমার কিছু ভয় নেই বাবা, বৈজুকে তার তেলপাকা সেই বাঁশের লাঠিটা নিয়ে নিতে বলেছি। আর—"

বিজয়ের ছয় ফিট বলিষ্ঠ দেহের পানে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, "বিজয়বাবু একাই তিন জনের সামিল—।" একটু ঢোক গিলিয়া পরে আবার বলিল, "কিন্তু বুঝলে বাবা, উনি এমনি অকৃতজ্ঞ যে তিন চার দিনের মধ্যেই নাকি চক্রধরপুর ছেড়ে যেতে চান—অথচ এ জায়গা ইংপ্তা তিনেকে ওঁর স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ক'রে দিয়েছে, তুমিও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ!"

"সত্যি বিজয়, এত শীগ্‌গির যাচ্ছ? বাস্তবিক তোমার স্বাস্থ্য কিন্তু খুব ভালো হচ্ছিল।"

"এখনো খুব ঠিক নেই, তবে যেতে হতে পারে—"

"পারলে এখানে আরও ক'টা দিন থেকেই যেয়ো—"

রমা ততক্ষণে তাহার শাল লইয়া ও বৈজু তাহার লাঠি লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। উত্তরে বিজয় মৃদুহাস্যে নমস্কার করিয়া ঘরের বাহির হইল।

রাস্তায় পড়িয়া কিছুদূর গিয়া রমা কহিল, "বাবা বল্‌ছিলেন কি আপনার পিসিমাকে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে—"

বাধা দিয়া বিজয় কহিল—"না না—তিনি ওসব ভালোবাসেন না—লোকজনের সঙ্গে বড় মেশেনও না—তাতে শুধু তাঁকে ব্যতিব্যস্তই করা হবে।"

বিজয়ের এইরূপ অসহিষ্ণু উত্তর শুনিয়া রমা একটু আশ্চর্য্য হইলেও কিছু কহিল না। বিজয় দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিল যে সে যে-কয়টা দিন এখানে আছে তাহার পিসিমাকে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ কিছুতেই ঘটাইতে দিবে না।

রমা একটু পরে বলিল, "বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করেন কিনা, তাই ও প্রস্তাবটা করেছিলেন। তবে আপনার পিসিমা যদি আমাদের

সঙ্গে পরিচয় অসন্তুষ্ট হ'ন—"রমার কথায় ক্ষুব্ধতার সুর অনুভব করিয়া বিজয় তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল—"না—না—আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন কেন—তবে তিনি সাধারণতই নিরিবিলি থাক্‌তে ভালবাসেন; তাই বল্‌ছিলাম যে তাঁকে অনর্থক—আচ্ছা আমিই তাঁকে বরং সুবিধামত একদিন জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌ব।"

রমা বলিল, "বেশ—তাই ভালো।"

"আমি কথাটা কবে তুল্‌তে পারব আপনাকে কিন্তু সঠিক বল্‌ছিনা; —কিন্তু আমার কথা না পেলে আপনারা যেন কোনো কথা তাঁকে বল্‌বেন না।"

"আচ্ছা।—বাবা সত্যিই কিন্তু আপনার পিসিমার সঙ্গে পরিচিত হ'লে খুসী হবেন—অবশ্য যদি তিনি বাবার সঙ্গে কথা ক'ন।"

বিজয় বলিল, "সে-ও একটা কথা বটে। তিনি আবার একটু প্রাচীনপন্থীও—"

রমা মুচকি হাসিয়া প্রসঙ্গ বদলাইয়া কহিল, "আপনি বুঝি খুব **liberal**?"

"আমি যাই হই না—"

"আচ্ছা বলুনই না—"

"শুধু **liberal** বল্লে ঠিক হবে না, আমি বোধ হয় একজন প্রচণ্ড সংস্কারবাদী—**outfront radical**—নিষ্কর্ম্মা লোকেরা—ব'সে ব'সে তো আর কাজ নেই—শুধু মনের সঙ্গে কসরৎ করে, আমার হয়েছে তাই। আপনি হয় তো ভাবছেন আমি হচ্ছি সেই জাতীয় জীব—যার বিয়ের সঙ্গে নাম নেই কিন্তু কুলোপানা চক্র!"

রমা চট্ করিয়া জবাব দিল, "আমি কিছুই ভাবছি না; কিন্তু আপনার **radicalism**এর স্বরূপ ব্যাখ্যা একটু শুন্‌তে পারি কি? অথবা—"

একটু চটুল হাস্যসহকারে বলিল—"I am treading on sacred ground."

হাসিয়া বিজয় বলিল—"কিছুমাত্র না। কিন্তু কোনো প্রসঙ্গ না এলে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা চল্‌তে পারে কি ক'রে? মোটামুটি বল্‌তে গেলে এই বল্‌তে হয় যে সমাজে বা ব্যক্তিগত জীবনে যা অন্যায় বা অশোভন ব'লে আমরা বিশ্বাস করি—তার সঙ্গে মাঝামাঝি রফা বা compromise ক'রে চলা আমার মনে হয় অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্তের পরিচায়ক এবং সংস্কারের উপায় হিসাবেও আমার মনে হয় পূর্ণ বিদ্রোহই হয় বেশী কাজের, এক মন্দ দূর করতে গিয়ে আর এক মন্দের প্রশ্রয় দেওয়ার চাইতে কঠোর সত্যানুবর্ত্তিতার ফল—moral effect—অনেক বেশী।" বলিতে বলিতে বিজয় হঠাৎ থামিয়া গেল; তাহার মনে পড়িল এ বক্তৃতা তো শুনাইল বেশ, কিন্তু তাহার জীনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আছে কতখানি! যে সামান্য মদের নেশার আধিপত্য মনের জোরে তাড়াইতে পারে না তাহার মুখে মনের জোর লইয়া সমাজের সঙ্গে লড়াইয়ের পরীক্ষার কথা বেশ শুনায়! যেমনি হঠাৎ থামিয়াছিল তেমনি হঠাৎ মুখ তুলিয়া সে বলিল, "কোনো মত পোষণ করা, আর সে মতানুবর্ত্তিতার ক্ষমতা অর্জ্জন করা কিন্তু অনেক তফাৎ। আমার কথা শুনে আপনি ভ্রমেও মনে ক'রে ফেলবেন না যে আমি নিজে এমন কোনো কাজ করি যাতে—"

রমা বাধা দিয়া বলিল "আপনার বিনয় রেখে দিন তো—"

বিজয় গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিল, "সত্যি বল্‌ছি—আমি যে কত বড় অপদার্থ তা' তুমি—আপনি জান্‌লে আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে ঘৃণা বোধ করবেন!" তারপর আপন মনেই যেন বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মানুষ হওয়া বড় কিছু শক্ত নয়—যদি—"

বিজয়ের এই হঠাৎ ভাবান্তর—তাহাকে উত্তেজনায় 'তুমি' সম্বোধন—রমাকে অত্যন্ত আশ্চর্য্য করিয়া তুলিয়াছিল; শুধু আশ্চর্য্য নয়—তাহার অন্তরে এতটা প্রবল সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল যে সে বিজয়ের মুখে চোখ পাতিয়া বলিল—"'যদি' কি ?"

"যদি"—বিজয়ের বুকের মধ্যে তখন যে তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছিল, বৈজু বাঁশের লাঠি কাঁধে করিয়া অনতিদূরে পশ্চাৎগামী হইতেছে না দেখিলে সে একথা বোধ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ যে—'যদি', তোমার মত একটি শুকতারা, রমা আমার জীবন-পথের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে আমার সামনে আলো জ্বালিয়ে দাঁড়ায়!"

বিজয় নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য কিয়ৎক্ষণ কোনো কথা কহিল না মিনিট তিনেক পরে মুখ তুলিয়া জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "যদি—কিন্তু না। কিছু সংস্কার সম্বন্ধে আপনি বোধ হয় আমার সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি!"

"আমার এ সম্বন্ধে মত খুব দৃঢ় বোধ হয় এখনো হয় নি—কিন্তু তবু আমার মনে যে সংস্কারকামীর কম বাধা ঠেলে এগুতে গেলেই বোধ হয় কাজের সুবিধা হয়, তার জন্য র'য়ে স'য়ে চলাই ভালো, বিদ্রোহ করা ঠিক নয়; বিদ্রোহ সংস্কারকের লাভের পথের বাধাকে বাড়িয়ে তোলে।"

"আমার ধারণা ঠিক উল্টো। আপাতঃভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় বটে বিদ্রোহ বাধাকে প্রবলতর ক'রে তোলে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস যদি খতিয়ে দেখতে চান, দেখবেন যে বিদ্রোহীর স্বমতের জন্য আত্মবলিদানই সংস্কারের মূলপত্তন করে গেছে। বাধা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রথমে যতই প্রবল হোক—সে বিদ্রোহ যদি মঙ্গলের নিদান হয় তো তার আত্মবলিদানের প্রবল শক্তির সাম্‌নে তা অনতিবিলম্বে হেরে যাবেই। উদাহরণ স্বরূপ শঙ্কর দেখুন, বুদ্ধ দেখুন, চৈতন্য দেখুন, খৃষ্ট মহম্মদ দেখুন—রাজনীতিতে ফরাসী

বিপ্লব, বলশেভিজ্‌ম্‌ দেখুন—দুনৌকায় পা দেওয়া মধ্যপন্থীর বক্তৃতায় কোন দিন কোন ফল হয় নি—বিদ্রোহীরাই তাদের কর্ম্মপথে বাধার সৃষ্টি করেছিল বটে, তেম্‌নি তা ভেঙে চূরমার ক'রেও তারাই দিয়ে গেছে। বাধা দেখলেই একটা রফা ক'রে নিয়ে compromise-এর দল নিজেদের হাল্কা ক'রে ফেলে। তাদের প্রচেষ্টা—যারা স্বমতের জন্য গ্লানি নিন্দা অপবাদ অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য ক'রে তাদের প্রচেষ্টার মতো লোকের মনে গভীর দাগ ফেল্‌তে পারে না—এমন কি তাদের চেষ্টা যদি শেষে বিফলতারই মাত্র ভাগী হয় তবুও না। কারণ দুনিয়ার কর্য্যের মূল্য বিচার শুধু সফলতার বাটখারায় ওজন করলেই হয় না, কার্য্যের জন্য সাধনায় ঐকান্তিকতার একটা মস্ত মূল্য আছে।"

রমা মনোযোগের সহিত সবটা শুনিয়া বলিল, "তা আছে বৈকি, কিন্তু এ রকম আত্মবিশ্বাস এবং সমাজের নিগ্রহ সইবার ক্ষমতা ক'জনার আছে।"

"ঠিক তাই নেই ব'লেই তারা সংস্কারক হবার গর্ব ও অধিকার পায় না। তারা গতানুগতিক 'ভালো লোক' ব'লে পরিচিত হয় মাত্র। এই দেখুন বিধবা-বিবাহ ক'জনে আজকাল খারাপ মনে করে, কিন্তু ঘরের বিধবা মেয়েটীর বিবাহ দিতে কেউ বড় অগ্রসর হ'তে চান না। আমার কথা হচ্ছে যেটাকে সত্য ব'লে মানি তাকে আঁকড়ে ধরার জন্য সমাজের হাজার অপমান, শাস্তি ও লাঞ্ছনা আমি তার মাথা পেতে নেবোই, তবে আমি মানুষ।"

রমা কহিল, "মানুষের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে অনেক সময় নিজের সুবিধামত বিশ্বাস ক'রে নেয় কিনা--যে এই আমার সত্য পথ, একেই আমি মেনে চল্‌ব, কিন্তু পরীক্ষায় পড়লেই তারা পেছু পা' হয়, কারণ প্রায় লোকই স্বার্থপর কিনা।--তার ওপর লোকলজ্জার ভয় বা অন্য কোনো ভয় তখন আরও ঘাড়ে চেপে বসে।"

"ঠিক বলেছেন! কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক। আমার বোধ হয় আমাদের গন্তব্যস্থানে প্রায় এসে পড়েছি,-- ঐ যে ফাঁকা জায়গা খানিকটা দেখা যাচ্ছে না, ঐ বোধ হয় সেই হ্রদ?"

"হ্যাঁ ঐ বটে। কিন্তু জায়গাটা কি খুব চমৎকার নয়? এখনি মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের সারি আমাদের এম্‌নি ক'রে ঘিরে ধরেছে যেন বেরুবার পথ নেই। জলের কাছে গেলে মনে হবে যেন একটা কূপের নীচে আমরা এসে গেছি। আর চারপাশের ঘেরা পাহাড়ের দেয়াল---যেন তাঁর উঁচু গাঁথুনি। আকাশে যেখানে তাদের মাথা ঠেকেছে ঐখানে উঠতে পারলে তবে পৃথিবীর ঘর-বাড়ী দেখতে পাব।"

বিজয় বলিল "ঐ দেখুন ডুবুডুবু সূর্য্যের লাল রং ঐ পাহাড়টার গায় পড়ে তার আধমরা গাছগুলোকে রূপকথার সেই কুচবরণ রাজকন্যার সোনালী গাছের বাগানের শ্রীতে মুড়ে তুলেছে!--"

"আবার পশ্চিমের পাহাড়টায় গা' জুড়ে কি দীর্ঘ কালো ছায়া---যেন সন্ধ্যার আঁচল এলিয়ে পড়েছে---"

দুইজনে যাইয়া জলের পাশে বসিল। বৈজু ততক্ষণ কাছে আসিয়া ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক হইতে কিছু গরম চা দু' জনাকে খাইতে দিল। বিজয় চা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "আপনি কালে খুব পাকা গিন্নী হ'তে পারবেন—" উত্তরে রমা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। চারিদিকের প্রতিধ্বনিতে মনে হইল যেন দিগ্‌বধূরা খিল্ খিল্ করিয়া সে হাস্যের প্রত্যুত্তর দিল।

বৈজু যতক্ষণ চা খাইতেছিল ততক্ষণ রমা ও বিজয় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ রমা বিজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া রাস্তা ছাড়িয়া হাত তিনেক দূরে একটা দেবদারু গাছের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইল। তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া বিজয় প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল হঠাৎ ওষ্ঠে অঙ্গুলি সঙ্কেতে সে তাহাকে কথা বলিতে নিষেধ

করিয়া তর্জ্জনী নির্দ্দেশে অনতিদূরে জলের পানে কি দেখাইল। বিজয়ের দৃষ্টি সেই নির্দ্দেশের অনুসরণ করিয়া দেখিল যে জলের ধারে একটা কৃষ্ণসার জলপান করিতেছে। জলপান শেষ করিয়া হরিণটা বড় কালো-জামের মতো ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছে এমন সময় দূর হইতে বৈজু সেটাকে দেখিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল। অমনি হরিণটা ছিলা ছেঁড়া ধনুর মতো সরু চার পা'য়ে প্রচণ্ড এক লাফ দিয়া বিদ্যুৎবেগে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইল! রমা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে বলিল, "আপনি তো অবাক্ হয়ে গিয়াছিলেন যে টেনে হিড়-হিড় করে আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বেশী জল্পনা ক'রে লুকোতে গেলে ও আমাদের আগেই দেখে ফেল্‌ত — ওরও জল খাওয়া হোত না—আমরাও ওকে এত সুন্দর ক'রে দেখ্‌তে পেতাম না।"

বিজয় মুখে একটু মুচকি হাসিয়া রমার কথার জবাব দিল মাত্র! রমা আবার কহিল "আপনার কিন্তু খুব জোর কপাল---প্রথমদিন বেড়াতে এসে আপনি একটা হরিণের দেখা পেলেন—আমি কতদিন এখানে এসেছি—কিন্তু এখানে এমন ক'রে হরিণ দেখা আমার আর ঘটে ওঠে নি।"

বিজয় কহিল, "তা বটে, কিন্তু আমাদের বোধ হয় ফেরা উচিত। সন্ধ্যে হ'য়ে এলো—"

বিজয়ের সমস্ত আত্মা মুহুর্মুহু রমার স্তবগানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। ফিরিবার পথে নানা কথায় অসতর্কভাবে তাহার মুখ হইতে রমার প্রতি মাঝে মাঝে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার বাণী বাহির হইয়া আসিতেছিল—যাহা বলিয়া সে পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল ও সশঙ্ক হইয়া দেখিতে-ছিল যে রমার মুখের ভাব কি রকম হয়। কিন্তু সারাটা রাস্তা সেদিকে

ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া রমা কেবল ছোটনাগপুরের পাহাড়ে কোন্ জাতীয় গাছ বেশী জন্মে এবং কেন জন্মে তাহা লইয়া তাহার উন্মনস্ক শ্রোতার সহিত আলোচনা করিতে করিতে বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িল। উভয়ে তখন উভয়কে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। বৈজুও নয়া বাবুকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া তাহার দিদিমণির পশ্চাদ্‌গামী হইতেছে এমন সময় রমার অলক্ষ্যে বিজয় তাহাকে ইসারায় কাছে ডাকিল। সারাটা বিকাল চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বেচারা তাহাদের জন্য—এক রকম বলিতে গেলে তাহারই জন্য—খাটিয়াছে এই কথা স্মরণ করিয়া বিজয় পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া গেল।

৮

ছয় সাত দিন পরে বিজয়ের কলিকাতা যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। রমারা জানিল, পিসিমা কিছুতে ছাড়িতেছেন না।

ইহার মধ্যে একদিন বিজয় রমার কাছে রীতিমত তাড়া খাইয়াছে—"আপনি বৈজুর হাতে কাল পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিতে গেলেন কেন? বেচারা আমার কাছে এসে তো ভ্যাবাচ্যাকা—নোটখানা আমার হাতে বাড়িয়ে দিলে। আমি ত অবাক্। একটু পরে বল্লুম, বাবু তোকে বক্‌শিষ দিয়েছেন। ও ত' কিছুতেই নেবে না। আমারো তখন মনে হোলো আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, হয়ত কি দিতে কি দিয়ে ফেলেছেন। এই নিন্ আপনার নোট।"

বিজয় আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। রমা বলিল, "ওসব বাজে

কথা রেখে দিন—বার করুন আপনার মণিব্যাগ, কৈ? এই বুঝি আপনার গরীবিয়ানা?"

"বিজয় কহিল, "মণিব্যাগ আমার নেই—"

রমা হাসিয়া কহিল, "যত economy একটা ব্যাগ্‌ কিন্‌বার বেলায়!"—বলিয়া টেবিলের একটা ড্রয়ার টানিয়া একটি রেশমের সূতায় তৈরী চমৎকার থলি বাহির করিয়া বিজয়ের পানে তাকাইয়া কহিল, "যে ক'দিন ক'লকাতা ফিরে মণিব্যাগ একটা না কিন্‌ছেন, সে ক'দিন এটা দিয়ে চালিয়ে দেবেন।" তারপর পাঁচ টাকার নোটখানি ভাঁজ করিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া বিজয়ের পানে বাড়াইয়া দিল। বিজয় নিঃশব্দে সেটা গ্রহণ করিয়া পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, "বৈজুকে অবশ্য এ টাকাটা নিতে বল্‌বেন—দয়া ক'রে ডাকুন ওকে—পাঁচ টাকায় আপনার আপত্তি থাকে তো এবার সেটা তুলে নিন। ওর সততায় আমি মুগ্ধ হয়েছি।"

"কিন্তু খবরদার ভবিষ্যতে আর এমন করবেন না। গরীব মানুষকে আপনি ইচ্ছে ক'রে দিচ্ছেন ব'লে আমি এবার আপনার প্রথম অপরাধ বলে মাপ করলাম"—বলিয়া রমা ফিক্‌ করিয়া হাসিল।

* * * * *

আরো সাত আট দিন গেল। বিজয় রমার সেবা ও শিক্ষাকার্য্যে প্রায় সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। রমা রোগীদের ওষুধ দিত, বিজয় তাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহাদের সংবাদাদি তাহাকে দিত—কারণ রমার ঘাড়ে একটা সংসার তো আছে। স্কুল কয়েকদিন হইতে রোজ চলিতে লাগিল—একদিন রমা যাইত—একদিন বিজয় যাইত, কিন্তু বিজয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিত তাহার সাহচর্য্যে ইহারা বুঝি তেমন প্রাণের আভাস পায় না।

কিন্তু সে ছাড়িবে না, তাহার অস্তিত্ব সে যেন এখন নিঃশেষে রমাকে বিলাইয়া দিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়।

রমারও দিন দিন একটু পরিবর্ত্তন হইতেছিল। বিজয়ের মত বয়স্ক যুবকদের সহিত রমা মিশিয়াছে। আজ তাহার পিতা তানপুরা ও কেতাব লইয়া ঘর লইয়াছেন; কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বেও তিনি চক্রধরপুরে একজন বিশেষ সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। প্রবাসী সমস্ত বাঙালীর সঙ্গেই তিনি সাগ্রহে পরিচয় করিয়া লইতেন এবং নবাগতেরাও তাঁহার মত বিদ্বান্ ও জনপ্রিয় লোকের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইত। সেই সূত্রে রমা অনেকের সহিতই মিশিয়াছে এবং নিঃসঙ্কোচে মিশিয়াছে—কারণ, বাপের নিকট হইতে সঙ্কোচ করিতে সে কোনো দিন শিক্ষা পায় নাই এবং পচা নভেল পড়িয়া তাহার মন রোম্যান্স করিবার জন্য উদগ্রীব ছিল না—কেন না কাজকে সে ভালোবাসিতে শিখিয়াছিল, আর পাঁচজন তাহার চক্ষে যা ছিল—রমা যদিও কোনো দিন মানিতে রাজী ছিল না যে তাহাদের চাইতে বিজয়কে সে কিছুমাত্র অন্য চোখে দেখে, কিন্তু তাহার নারীহৃদয় তাহার মধ্যে একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছিল—যেটা সে অন্য কোথাও লক্ষ্য করে নাই। বিজয়ের সমস্ত ব্যবহারে একটা প্রচ্ছন্ন কাতরতা ছিল যাহা রমার কোমলচিত্তকে সর্ব্বদা পীড়া দিত। নানা কাজকর্ম্ম ও সহচর্য্যের ভিতর দিয়া সে যে তাহার কতখানি আপন হইয়া পড়িয়াছে তাহার সঠিক অনুভূতি তাহার ছিল না, কিন্তু সে লক্ষ্য করিয়াছিল—এই যে পাহাড়ের মতো প্রচণ্ড দেহ মানুষটি নিজেকে হতাশ স্বরে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দেয়, সে তাহার জন্য—না—না তাহার জন্য করিবে কেন, সৎকার্য্যের জন্যই কতখানি কাজ করিতেছে—তাহাকে বিজয় কতখানি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করিয়া চলে তাহাও তো তাহার অবিদিত ছিল না। রমা বুঝিতে পারিত না—কেন এ—কি এ; বুঝিতে বড় চিন্তাও করিত না।

প্রিয়দর্শন এ যুবকটিকে তাহার ভালো লাগিত—কাহার ভালো তাহাকে না লাগে—এমন স্বভাব, এমন শ্রী, এমন বুদ্ধি ও জ্ঞানের গভীরতা—তাহার বাবা তো তাহাতেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন—এমন ঋজু সবল দীর্ঘ দেহ—এমন কর্ম্মপ্রাণতা—এমন নিজেকে ছোট করিয়া দেখার প্রবৃত্তি, এমন প্রাণ-মাতানো সরল হাসি কাহাকে না মুগ্ধ করে ?

কিন্তু সে ভালো-লাগার নিকট হইতে ভালোবাসার সাগরতীর কত দূর ছিল তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখে নাই। রমার স্বাভাবিক হাস্য-মুখর মিষ্ট স্বভাব আজকাল আরো যেন স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যে সহস্রগুণ-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ নতুন মাধুরিমার মূলে বিজয়ের কতখানি কৃতিত্ব ছিল—তাহার মনের একটা অংশ অলক্ষ্যে বিজয়ের মূর্ত্তিখানি দিনের মধ্যে কতখানি সময় যে ধ্যান করিত তাহার কল্পনা সে করিতে পারিলে হয় তো লজ্জায় শিহরিয়া উঠিত।

সেদিন রমার পিতা ভোরবেলা তানপুরা লইয়া বিভাস আলাপ করিতেছিলেন, এমন নময় রমা প্রায় ছুটিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, "বাবা তুমি একবার উঠে এসো—দেখেই যাও মজা"

"কি মা।"

রমা পিতার হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিল "ওঠোই না বাবা, ব'সে ব'সে কেবল 'কি মা'। ওঠো কাণ্ডটা দেখেই যাও—বল্লে ওর অর্দ্ধেক মজাও থাক্‌বে না—"

"পাগলীর রকম দেখ—দিনে দিনে ক্ষেপে যাচ্ছে! হঁ্যা মা, তোর হয়েছে কি! এতদিন ছিলি আনন্দের ঝরণা, আজকাল হ'য়ে পড়েছিস্ যেন আনন্দের জলপ্রপাত!"

"তোমার কবিত্ব রাখ—"

"সত্যি বল্‌ছি আজকাল তোর চোখে জোনাকীর আলো জ্বল্‌ছে।"

"যাও তোমার সঙ্গে কথা কইব না—"

"আচ্ছা—চল্‌ চল্‌ মা দেখি তোর কাণ্ডটা কি ?" রমা ত্রস্তচরণে বৈজু যে ঘরে থাকে সেই ঘরের দুয়ারে গিয়া আঙুল দিয়া পিতাকে কি দেখাইয়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমার পিতা দেখিলেন—বৈজু কোথা হইতে ছোট্ট একটি পাথরের হনূমানের মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে তেল-সিন্দূরে লিপ্ত করিয়াছে, কণ্ঠে তাহার ফুলের মালা দোলাইয়াছে, চরণে গোটা দুই ফুল দিয়াছে—সাম্‌নে একটি ছোট দীপ ও ধূপাধার রাখিয়াছে। মূর্ত্তিখানি একখানি জলচৌকির উপরে দাঁড় করানো, তাহার পায়ের কাছে একখানা দেব-নাগরী অক্ষরে লেখা রামায়ণ।

মিনিটখানেক এদিকে চাহিয়া একটু মৃদুহাস্য করিয়া ফিরিতে ফিরিতে বৃদ্ধ রমাকে কহিলেন, "এতে এত হাস্‌বার কি আছে।"

রমা হাসিতে ঢলিয়া পড়িতে পড়িতে কহিল, "নাঃ, হাসির কিছুই নেই! রাজ্য-শুদ্ধ আর জিনিষ পেলে না—একটা হনূমানের মূর্ত্তি এনে তার কি ঘটা ক'রে অর্চনা! বাব্বাঃ"—

বৃদ্ধ এবার গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ছিঃ মা—কারু ভক্তি ও শ্রদ্ধার বস্তুকে এমন তাচ্ছিল্য করতে নেই! বৈজুর সাম্‌নে তুমি যদি এই রকম উপহাস করতে তবে আমি তোমায় মন্দ বল্‌তে বাধ্য হ'তাম। হনূমান একাগ্রতা ও ভক্তির কত বড় একটা প্রতীক তা' কি তুমি জানো না ?"

"তবে বাবা অসভ্যদের কাছে গাছ সাপ পাথর এসব কোনো কিছুর প্রতীক—তাই বলেই ত তারা পূজা করে—সে পূজারও কোনো দোষ নাই—"

"নাই-ই তো—আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও এককালে ঐ রকম পূজাই করতেন। মানুষ প্রথমে সৃষ্ট হ'য়েই বেদান্ত রচনা করেনি, তাদের সাপ ব্যাং পূজায় একাগ্রতার সাধনা দিয়েই বেদান্তের মূল পত্তন হয়েছিল। ঐটুকুও যদি না থাকত, এতদিন জানোয়ার হ'য়ে উঠত !"

"তার মানে। নাস্তিক ব'লে একটা দল আছে, তারা কি সব জানোয়ার।"

নাস্তিকদের বৃদ্ধ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন—তাহাদের প্রসঙ্গে তিনি উষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

"নাস্তিক। দুনিয়ায় খাঁটী নাস্তিক কয়টা আছে বল্‌তে পার? বিপদে পড়লে সবাই—"

বাধা দিয়া রমা কহিল—"সবাই বিষম ভক্ত হয়ে ওঠে, তা আমি জানি। কিন্তু বাবা এ-ও ঠিক্, দুনিয়ায় খাঁটী আস্তিকের সংখ্যাও খুব বেশী নয়—"

বৃদ্ধ কহিলেন, "আস্তিক নাস্তিকের সংখ্যার অত চুলচেরা হিসাব আমি করতে চাইনে কিন্তু একটা অশরীরী ক্ষমতাকে বেশীর ভাগ লোকই অল্প বিস্তর মেনে চলে—তারা বিশ্বাস করে কৃতকর্ম্মের জন্য একদিন একজনার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ ধারণা না থাক্‌লে দুনিয়া পাপে ছেয়ে যেতো—নাস্তিকদের অসাধ্য কর্ম্ম নেই, কেন না তারা কারো কাছে নিজেদের দায়ী মনে করে না। এই ভগবান আমরা মেনে চলি বলেই মানুষের পাপ পুণ্যের ভয় আছে—একটা শৃঙ্খলা আছে—এও আস্তিক্য বুদ্ধির একটা মস্ত সুফল—"

রমার ভগবানে অচল বিশ্বাস ছিল—কিন্তু নাস্তিকেরা এক একটি মূর্ত্ত শয়তান এও তাহার মন মানিতে চাহিতেছিল না।

রমা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল এমন সময় হাস্যমুখে বিজয় ঘরে প্রবেশ করিল। নমস্কারান্তে বিজয় কহিল, "সেদিন শ্রীমতী রমা আমায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন; আজ যদি আমি আপনাকে, রমাকে আর বৈজুকে নিমন্ত্রণ করি কোথাও বেড়াতে যেতে, আপনারা গররাজী হবেন না তো?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "হঠাৎ বেড়াবার নিমন্ত্রণ কেন বিজয় ?"

"আমরা—মানে পিসিমা—ক'লকাতা থেকে তাঁর মোটরখানা আনিয়েছেন কিনা—আমায় বল্লেন যে ওটাকে বিকেলে একবার দৌড় দিয়ে আন্‌তে, সব **parts** ঠিক আছে কি না দেখ্‌বার জন্য। তিনি নিজে আজ আবার বেরুতে নারাজ—তাঁর পায়ের বাতটা নাকি আজ বেড়েছে।—তাই আপনারা যদি দয়া ক'রে আমার নির্জন ভ্রমণটা সরস ক'রে তুলতে সাহায্য করেন তবে ভারী সুখী হই।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "ড্রাইভার কি মোটর মেকানিক যে আছে সে-ই তো দৌড় দিয়েই আন্‌তে পারে, তুমি নয় বিকেলে আমাদের এখানে এসো—চা খেয়ো। রমা বেহালায় ছায়ানটের চমৎকার একটা গৎ শিখেছে তোমায় শোনাবে এখন—।"

বিজয় কহিল—"আজ্ঞে ড্রাইভার যে আমিই—**motor mechanism** আমি একটু শিখেছিলাম—তাই তো পিসিমা আমায় এ হুকুম করেছেন। তাঁর ড্রাইভারটা আবার দিন কুড়ির ছুটিতে গেছে কিনা—"

"ওঃ তুমি দেখ্‌ছি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ—আচ্ছা আমি—কিন্তু ওঃ হো, আজ আবার বিকেলবেলা ষ্টেশন-মাষ্টার মিষ্টার রামলিঙ্গম্‌এর ছোট মেয়েটিকে একবার দেখ্‌তে যেতে হবে—তিনি বার বার ক'রে কাল সন্ধ্যায় ব'লে গেছেন—তার খারাপ-ধরণের রক্তামাশয় হয়েছে। তা' না হয়—বৈজু আর রমাই তোমার সাথী হবে এখন, আমায় রামলিঙ্গম্‌এর বাড়ী নামিয়ে দিয়ে যেয়ো।"

"বেশ তাই ভালো, কিন্তু গৎ শোনাবার নিমন্ত্রণটা কিন্তু ছাড়ছি না আমি। বেলা তো বেশী হয়নি—সেটা এখনই রক্ষা ক'রে গেলে কেমন হয়—চা'টা না হয় বেড়িয়ে ফিরে ওবেলাই খাওয়া যাবে।"

রমা হাসিয়া বলিল "বিজয়বাবু কি দুষ্টু বাবা—নিমন্ত্রণের এই অংশটা

তুমি ফিরিয়ে নাও। আমার হাতে গৎটা এখনো রপ্ত হয়নি—আমি এখন কিছুতে বাজাতে পারবো না।”

কিন্তু এ অস্বীকার বেশীক্ষণ টিঁকিল না। রমা বেহালাখানি খুলিয়া পিতার পার্শ্বে বসিল। বিজয় চেয়ারখানি ঘুরাইয়া এমনভাবে বসিল যেন রমার মুখ ও আঙ্গুলের খেলা স্পষ্ট দেখা যায়। ছায়ানটের সুরের সাবলীল নৃত্যভঙ্গিমায় বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বিজয় তাহার সম্বদ্ধ দৃষ্টিতে রমার পানে মুগ্ধভাবে চাহিয়া রহিল। বাজনা শেষ হইলে রমা মুখ তুলিয়া চাহিতেই বিজয়ের সেই দৃষ্টি তাহার চোখে পড়িয়া তাহাকে আগণ্ডকর্ণমূল রাঙাইয়া তুলিল। সে দৃষ্টিতে প্রেমনিবেদনের যে রাঙা চিহ্নরেখা তাহার অন্তরের পাতে মোহময় প্রতাপ জাগাইয়া দিল, তাহা রমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি না হইলেও তাহার সমস্ত দেহ যেন সে দৃষ্টিপাতে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। রমা ধীরে ধীরে কাজের ছুতায় ভিতরে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ তখন বিজয়ের সহিত নানা কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত হইলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর বৃদ্ধ হঠাৎ কহিলেন, “আমার বাড়ীতে তোমার বয়সী অতিথি একটি শীগ্‌গীরই আস্‌ছে, তখন তোমাদের আসর আরো জম্‌কে উঠ্‌বে।”

“তিনি কে ?—”

“আমার একটি বন্ধুর ছেলে—যতীশ দাশগুপ্ত। এবার প্রথম হ’য়ে কেমিষ্ট্রিতে M. A. পাশ করেছে। আমার বন্ধুবর রমাকে দেখে ভারী পছন্দ করেছেন—তাঁর ইচ্ছা পুত্রবধূ করেন। বংশও তাদের খুব ভালো —কিন্তু উভয়ের বনিবনাও হবে কিনা তাই কতকটা দেখ্‌বার জন্য তাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি। রমাকে আমি যে রকমে মানুষ করেছি তাতে সে হয়তো আমার কথায় কখনোই কথা কইবে না—তবু তার মনটা পরীক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য তো বটে ?—”

বিজয় কোনমতে বলিতে পারিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈকি ?"

"আর দ্যাখো, রমাকে এ কথাটা এখনো আমি বলি নি ; তারা পরস্পর পরিচিত হবার পরই এ কথাটা তাকে বলা ভালো হবে—না এখনই ব'লে ফেল্‌ব ?"

"তা আপনি যা ভালো বিবেচনা করবেন—তাই ভালো হবে।—আমি এখন উঠি তাহলে, বেলা সাড়ে ন'টা বাজ্‌তে চল্ল।"

রাস্তায় পড়িয়া বন্ধ ছাতা হাতে করিয়া চলিতে চলিতে ঝাঁ ঝাঁ রোদেও বিজয়ের মনে হইতেছিল পৃথিবীর সমস্ত আলো বুঝি নিভিয়া গিয়াছে।

৯

বৈকালে রামলিঙ্গম্‌এর বাসায় রমার পিতাকে নামাইয়া দিয়া বিজয় চাইবাসার রাস্তা ধরিয়া মোটর চালাইয়া দিল। রমা তাহার পাশে স্থির হইয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে গাছগুলা কিরূপ দ্রুত পিছনে চলিয়া যাইতেছিল তাহা লক্ষ্য করিতেছিল—আর মধ্যে মধ্যে লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিল এই মনে করিয়া যে এই বেড়াইতে বাহির হইবার কল্পনায় কি আগ্রহে তাহার দিনটা আজ কাটিয়াছে। তখনও রৌদ্র পড়ে নাই—সাড়ে চারটার সময়ও বিজয়কে না দেখিয়া সে তো প্রায় হতাশ হইয়া গিয়াছিল ! তারপর যখন বাড়ীর দরজায় মোটরের হর্ণ শুনিল এবং বিজয় সত্যই তাহা হইতে নামিয়া আসিল তখন সে যত খুসী হইবে ভাবিয়াছিল, তত খুসী তো হয় নাই ! একটা অননুভূত লজ্জা যেন তাহার বোধ হইতেছিল—বেড়াইতে না গেলেই ভালো হয়। এখনও সে মাঝে মাঝে **stcering**

wheel-এ বিজয়ের হাত দু'খানির পানে চাহিয়া দেখিতেছিল—মুখের পানে তাকাইতে যেন সাহস হইতেছিল না। তীব্র হাওয়ায় দুই একটা চূর্ণকুন্তল তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল—তর্জ্জনী ও মধ্যমা দিয়া তাহা সরাইয়া রমা এইবার নিজের সঙ্কোচে বিরক্ত হইয়া তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়া কহিল—"কতদূর যাবেন ?"

—"কেন আপনার ভালো লাগছে না—আরো আস্তে চালাবো কি ?"

"না—না, বেশ জোরেই চলুক—বেশ চমৎকার যাচ্ছে। আপনি কিন্তু বেশ পাকা শোফারের মত চালাচ্ছেন !"

"বটে !"

"বাবা আজ বলছিলেন আপনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কাজই কিছু কিছু পারেন।"

"তার মানেই **Jack of all trades, but master of none !**"

রমা তাড়াতাড়ি বলিল "না না, তা হবে কেন ?—বাবা আপনার কত প্রশংসা করেন আপনি জানেন না।—আপনার কথা বলেন **'to see him is to love him'** !"

বিজয় দুষ্টামীর একটু হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু কথাটা কি সত্যি ?—আপনার কি মত ?" এমন চটুল কথায় রমা বিরক্ত হয়, কিন্তু আজ রাগিল না। একটু রাঙিয়া, একটু হাসিয়া জবাব দিল, "যান্—আপনাকে কোন কথাটি বলে রক্ষা পাবার জো নেই, আপনি বিষম দুষ্টু—"

বিজয় উত্তর দিল—"আজ যে আপনি এ ঠাট্টার কথায় রাগ ক'রে বসেন নি এই আমার পরম ভাগ্য—আমার তো ভয়ই হচ্ছিল। সেদিন আপনাকে সুন্দরী বলায় আপনি যে চটে গিয়েছিলেন !"

"তখন আপনি ভালো ক'রে পরিচিতও হন নি—কিন্তু এখন তো আপনি বন্ধুস্থানীয়।"

"সত্যি ?" তাহার গলা ধরিয়া আসিতেছিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল রমা যতীশ দাশগুপ্তের আগমন সংবাদ ও তাহার উদ্দেশ্য জানিয়াছে কি ?

একটা উঁচু পাহাড়ের গোড়ায় মোটর থামাইয়া বিজয় রমাকে কহিল, "চলুন একটু পাহাড় চড়াই ক'রে আসি—আপনার আপত্তি হবে না তো ? বৈজু এখানে মোটর পাহারা দিক্।"

রমা সোৎসাহে লাফাইয়া মোটর হইতে মাটিতে পড়িয়া কহিল—"বাঃ, সে বেশ মজা হবে, চলুন।" বলিয়া আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া বাঁধিল।

পাহাড় চড়িতে আরম্ভ করিয়া বিজয় কহিল, "আপনার পরিশ্রম বোধ হ'লেই বল্‌বেন নেমে পড়া যাবে।"

রমা উঠিবার উৎসাহে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে কহিল, "নিশ্চয় দেখবেন, আপনার চেয়ে আমি আগে কখ্‌খনো হাঁপিয়ে প'ড়ব না !"

"আপনার যথেষ্ট জোর আছে আমায় অনুমান করতেই হবে ; নইলে গর্ত্ত থেকে আমার মত পাহাড়কে হাত ধ'রে টেনে তুল্‌তে চেয়েছিলেন ?" —ফিস্ করিয়া বিজয় হাসিল।

রমা পথরোধকারী একটা লতা টানিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, "টেনে তুলতে পারি কি না তার পরীক্ষা সেদিন হয়নি—যেন কোনো দিন হয়ও না—কিন্তু পারি যে এটা খুব সত্যি—আমার গায়ে ঢের জোর আছে।"

বিজয় এবার উত্তর দিল না। দুই জনে পাহাড় বাহিয়া উঠিতে লাগিল। কখনও লাফাইয়া, কখনও হাঁটু গাড়িয়া কখনও গাত্র সঙ্কুচিত করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে তাহারা একটা খোলা জায়গায় মস্ত একটা পাথরের স্তূপের উপর আসিয়া পড়িলে বিজয় কহিল, "এইখানে একটু বসা যাক্, অনেকদূর এসে পড়েছি—মোটর

সমেত বৈজু দেখুন আড়ালে পড়ে গিয়েছে। সন্ধ্যের আগে আবার নাব্‌তেও তো হবে।”

“আচ্ছা বসুন—ঐ দেখুন বিজয়বাবু, কতদূর পর্য্যন্ত জমি দেখা যাচ্ছে—ঐ চক্রধরপুরের ঘরবাড়ীগুলি দেখুন—দেখ্‌তে পাচ্ছেন? যেন এক একখানা খেলাঘর! কাদের কোন্‌খানা কিচ্ছু চেন্‌বার জো নেই!”

“দেখেছি। কিন্তু এতক্ষণে আমার সত্যি বোধ হচ্ছে আপনি সত্যি আমায় গর্ত্ত থেকে টেনে তুল্‌তে পারতেন—” বলিয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে বিজয় পরিশ্রমক্লিষ্ট রমার গণ্ডে রক্তের ঝলক লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া স্বাস্থ্যের দীপ্তি যেন এই পরিশ্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া দেখা দিয়াছিল। সে বিজয়ের চাইতে কিছুমাত্র বেশী হাঁপায় নাই। কপালে ও ওষ্ঠে তাহার বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম জমিয়াছিল, তর্জ্জনী দিয়া তাহা মুছিতে মুছিতে রমা কহিল, “কেমন—পারতাম না? নিশ্চয় পারতাম।”

তাহার দীপ্ত মুখের পানে চাহিতে চাহিতে বিজয়ের মাথার মধ্যে সব যেন এক একবার গোল হইয়া যাইতেছিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন ঐ সুন্দরীর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কহিতে চাহিতেছিল—দেহটাকে তো তুমি গর্ত্ত হইতে তুলিতে পারিতে—কিন্তু এ হতভাগার মনটাকে পাঁকের গর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিবার ভার কি তুমি লইবে দেবি?”

অতি কষ্টে তাহার এ ইচ্ছা সে দমন করিল। মনে মনে ভাবিল—আমার মতো অপদার্থকে এ বালিকা ভালোবাসিতে পারে না—তাছাড়া প্রাণ গেলেও এ বালিকার সঙ্গে সে ছলনা করিতে পারিবে না—তাহার প্রকৃত স্বরূপ খুলিয়া সব কথা তাহাকে বলিতে হইবে।……কিন্তু সে বলা কি বিষম! সে তো তাহাকে এতদিন কি মানুষ ভাবিয়া আসিয়াছে! হায় রে অদৃষ্ট!—তাছাড়া রমার বাপ তাহার অপেক্ষা রমার জন্য অনেক

যোগ্যতর পাত্র স্থির করিয়াছেন—সে কেন মধ্যে আসিয়া একটা গোল-যোগের সৃষ্টি করিবে ?······

একটু পরে বিজয় নিজেকে কিছু সাম্‌লাইয়া লইয়া পকেট হইতে টেনিসন লিখিত 'মড্‌' একখানা বাহির করিয়া রমার হাতে দিয়া কহিল—"এ থেকে বেছে বেছে দু' একটা জায়গা আপনার পড়তে ভালো লাগ্‌তে পারে—"

বইখানা না়ড়িয়া চাড়িয়া অস্ফুটস্বরে রমা বলিল "ম—ড্‌" ; একটু পরে বলিল, "নাঃ, আপনিই পড়ুন—জোরে পড়বেন।—আপনি কিন্তু চমৎকার পড়েন, বিশেষত ইংরিজী—আড়াল থেকে শুন্‌লে বোঝবার জো নেই! যে খাঁটী ইংরেজে কথা কইছে কি-না।"

রমার মুখে সানন্দে নিজের প্রশংসা শুনিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বই হইতে মুখ না তুলিয়া বিজয় বলিল, "কোনখানটায় পড়ব ?"

"বেছে বেছে যেখানে আপনার ভালো লাগে পড়ুন—**Come into the garden Maud**—ঐ জায়গা থেকেই নয় প্রথম সুরু করুন।"····

কিছুক্ষণ পড়া হইতে হঠাৎ সশব্দে বই বন্ধ করিয়া বিজয় বলিল, "আর নয়, এবার চলুন—"

রমা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল—তাহার এই হঠাৎ উঠিয়া পড়ায় সে বিস্মিত হইল। দাঁড়াইয়া পড়িয়া হঠাৎ অস্তগামী সূর্য্যের পানে দৃষ্টি পড়ায় সে বলিল, "আর একটু দাঁড়ান—দেখুন ডুবু ডুবু সূর্য্য কেমন রাগে কাঁপতে কাঁপতে চোখ রাঙাচ্ছে—অস্তটা দেখে নামি—কেমন ?"

অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী আলো রমার মুখে বুকে সর্ব্বাঙ্গে ছাইয়া পড়িয়াছিল। বিজয় সেদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "না না চলুন—শেষটায় পাহাড় থেকে না নাম্‌তেই অন্ধকার হয়ে যাবে—" তাহার নিজেকে আর বেশীক্ষণ বিশ্বাস হইতেছিল না।

রমা একবার ভাবিল প্রতিবাদ করে—উঠিতে তিন কোয়ার্টার খানেক লাগিয়াছে, নামিতে বড় জোর আধঘণ্টা লাগিবে—সূর্য্যাস্তটা দেখিয়া গেলেও তো হয়—কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া বিজয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল। বিজয় অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে যাইতেছিল মিনিট দুই চলিয়াই হঠাৎ একটা মস্ত পাথরের উপরে পা হড়কাইয়া সে প্রায় পনের হাত নীচে সশব্দে পড়িয়া গেল। রমা অস্ফুটে আর্ত্ত-চীৎকার করিয়া চাহিয়া দেখিল বিজয় ধূলা ঝাড়িয়া উঠিল না—মাটীতে পড়িয়াই আছে। তাহার ওষ্ঠ ও কণ্ঠ ত্রাসে তখন শুকাইয়া গেল। ত্রস্তে বিজয়ের পার্শ্বে নামিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ফিট্ হইয়াছে—মাথার পিছনে খানিকটা কাটিয়াও গিয়াছে। নিজে অসহায়া একাকিনী—সঙ্গী মূর্চ্ছাগত—তথাপি সে কিঞ্চিৎ ভীত হইলেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল না। বিজয়ের কানের কাছে মুখ লইয়া বার কয়েক ডাকিল, 'বিজয়বাবু, বিজয়বাবু!'—সাড়া নাই। মোটর-সমেত বৈজুকে যদিও দেখা যাইতেছিল না, তবুও প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কতবার ডাকিল—'বৈজু' 'বৈজু'—যদি ঘন ঝোপের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া আওযাজ গিয়া বৈজুর কানে পৌঁছায়।—কিন্তু সাড়া মিলিল না। এদিকে ক্ষতস্থানটা দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব হইতেছিল; তখনই জলপটি বাঁধিয়া দেওয়া দরকার—কিন্তু কাছে জল কৈ? তাহার মনে পড়িল নামিবার সময় একস্থানে পাথরের ফাটল দিয়া তির্ তির্ করিয়া সে জল ঝরিতে দেখিয়াছে। সে ত্রস্তে নিজের শাড়ীর আঁচল খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া ক্ষতস্থানে একটা ব্যাণ্ডেজ করিয়া জল আনিতে ছুটিল। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—যেন ইহার উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে—যদি মূর্চ্ছিত লোকটির তেমন কিছু হয়—তাহার হঠাৎ মনে হইল তাহার জীবন যেন মুহূর্ত্তে অমাবস্যার অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলিবে। ছুটিতে তাহার হাতের এক জায়গা ছড়িয়া গেল, ব্লাউসটা কাঁটায় বাধিয়া খানিকটা

ছিঁড়িয়া গেল, পাথরে হোঁচট খাইয়া হাঁটুটা জখম হইল—কিন্তু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জলের কাছে পৌঁছিয়া সে গা হইতে আঁচলটা সবখানি খুলিয়া জলে আগাগোড়া ভিজাইয়া লইল। বার বার তো সে এতদূর তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে না। লজ্জা? কিসের তাহার লজ্জা এই কি তাহার লজ্জা করিবার সময়? তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়—প্রিয়তম—হ্যাঁ প্রিয়তমই তো, কি মূর্খ সে এতদিন তাহা বোঝে নাই।—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া—তাহার আবার এখন লজ্জা কি?

ফিরিয়া আসিয়া ধীরে রমা বিজয়ের মাথাটা কোলে লইয়া ধূলার উপর বসিয়া পড়িল। প্রথমে ব্যাণ্ডেজটা ভিজাইল—তারপর কপালে চোখে-মুখে আঁচল রগড়াইয়া কয়েকবার জলের ঝাপটা দিল। তথাপি সম্বিৎ হইল না দেখিয়া বিজয়ের নীলাভ ওষ্ঠে ধীরে ধীরে আঁচল টিপিয়া জল দিতে লাগিল। জল দিতে দিতে তাহার মনে হইতেছিল তাহার জীবন তর্‌ তর্‌ করিয়া নিরুদ্বেগেই এতদিন বহিয়া আসিতেছিল—কিন্তু কোথা হইতে এই মানুষটী আসিয়া তাহার প্রাণ-মন সব কাড়িয়া লইল? হে ভগবান্‌, সে কেন পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল না—উনি বেদনা না পাইলে তো ঐ বলিষ্ঠ বাহুতে তাহাকে পুতুলটির মতো তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। সে এমন কি সুকৃতি করিয়াছে যে তাঁহাকে পাইবে?

মিনিট পাঁচেক পরেও যখন বিজয়ের জ্ঞান হইল না তখন রমার ভয় বাড়িয়া উঠিল। তবে কি সত্যই এত সাংঘাতিক আঘাত হইয়াছে যে—না না ভগবান্‌, এত নিষ্ঠুর হইবেন না—কৈ কোনদিন সে তো সজ্ঞানে তাঁহার নিকট অন্যায় করে নাই—আর তিনি কি তাহাকে এত বড় শাস্তি দিবেন? কিন্তু সংজ্ঞা হইতে যদি রাত হইয়া যায়—কেমন করিয়া এ বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া পাহাড় হইতে অন্ধকারে নামা যাইবে?—এক বৈজু যদি দেরী দেখিয়া লোকজন লইয়া খোঁজে আসে। কিন্তু সে খুঁজিয়া পাইবে

কি ! ও দিকে বাবাও কত দুশ্চিন্তায় পড়িবেন—বিজয়বাবুর পিসিমাও সাগ্রহে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চাহিয়া আছেন। সে আকুল হইয়া বিজয়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া ডাকিল, "বিজয়বাবু, বিজয়বাবু"—সাড়া নাই।

আরো চার পাঁচ মিনিট গেল। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে—দুই হাতে বিজয়ের চিবুকসমেত মাথাটা বুকে চাপিয়া হৃদয়ের সমস্ত শুভকামনা ঢালিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে রমা আবার ডাকিল—"বিজয়বাবু—বিজয়বাবু, একবার চোখ মেলুন—" সাড়া নাই। এবার রমার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া বিজয়ের গণ্ডে কপালে ভ্রূতে পড়িতে লাগিল। রমা আর্ত্তকণ্ঠে আবার ডাকিল—নিজেও সে তখন প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। কুন্তল এলাইয়া পড়িয়াছে, নয়নে অশ্রুধারা—অঙ্গে অঞ্চল নাই—বিজয় হঠাৎ সম্বিৎ পাইয়া এ অবস্থায় তাহাকে দেখিলে ব্যাপারটা যে কি অশোভন দেখাইবে তাহা তাহার বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বিজয় একবার বিড়বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিঃ রয়,—আপনি, আচ্ছা, তাহলে —তক্ তক্—কখন তুমি কখন কখন…"

তাহার মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতে দেখিয়া, রমার ভগ্ন আশা ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি কাপড়খানাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া আবার ডাকিল, "বিজয়বাবু—চোখ মেলুন, এই যে আপনার কাছে আমি রয়েছি—বিজয়বাবু—"

বিজয় এবার পাশ ফিরিয়া মোড়ামুড়ি দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল —"একি আমার কি হয়েছে ?"

রমা সাগ্রহে বলিল "আপনার ফিট হ'য়েছিল—আপনার কাছে এই যে আমি আছি—আমি রমা।"

"ওঃ পাহাড় থেকে নামতে আমি পা' পিছ্‌লে পড়ে গিয়েছিলাম না—"

—"হ্যাঁ"—

"আমি একটা জানোয়ার—আপনাকে কত কষ্ট দিলুম, আপনি—"

রমা সস্নেহে তাহার মাথার চুলগুলায় আঙুল চালাইতে চালাইতে তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল "কিচ্ছু কষ্ট হয় নি আমার। কিন্তু আপনি একটু উঠ্‌তে চেষ্টা করতে পারবেন কি? না, আপনাকে এখানে শুইয়ে রেখে আমি বৈজুকে ডেকে আনব?"

এতক্ষণে বিজয়ের পূর্ণসংজ্ঞা ফিরিয়াছিল। সে অনুভব করিল, রমার জানুর উপর মাথা দিয়া সে শুইয়া আছে—অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। ক্রমে তাহার পরিষ্কার মনে পড়িল কেমন করিয়া সে পড়িয়াছিল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল শরীরে মানুষের মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এবার বিজয়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে রমার দিকে চাহিয়া অশ্রুগোপন না করিয়া বলিয়া উঠিল, "রমা দেবি, কেন আপনি এত ক'রে আমার মূর্চ্ছা ভাঙালেন—না ভাঙলেই তা ছিল ভাল—আমার অতীত জীবনের সাম্‌নে যদি এমনি করেও একটা পর্দ্দা পড়ে যেত আমি বেঁচে যেতাম, ভবিষ্যতে সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমায় বেঁচে থাক্‌তে যদি না হোতো—"

রমা মাথা নত করিয়া নাক খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, "আমি—আমরা তো আপনার বন্ধুস্থানীয়—আপনার বেদনার কথা আমায় ব'লে কি আপনার একটু ভালো—মানে—আমায় বল্লে আমি কি আপনার মনের ভার পাত্‌লা করতে সাহায্য করতে পারবো না?"

বিজয়ের তখন নিজের ব্যাণ্ডেজ, রমার ছেঁড়া শাড়ী, ভেজা বিস্রস্ত বেশভূষা, তাহার অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন প্রভৃতি ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

হঠাৎ বিজয় এও দেখিল, রমার নত মুখ হইতে টস্ টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে!

এ কি তবে—তবে কি রমাও তাহাকে করুণামাত্র ছাড়া অন্য কিছু…?

সে চকিতে ডান হাত বাড়াইয়া রমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "একি রমা তুমি কাঁদ্‌ছ! কেন? আমায় বল বল—তুমি হয়তো আশ্চর্য্য হচ্ছ রমা—কিন্তু একথা তোমার কাছে আমি লুকোতে পার্‌লাম না—মাপ কোরো—আমি তোমায় ভালোবাসি—কত ভালোবাসি জানি না—কেননা জীবনে প্রথমবার এই আমি ভালোবেসেছি। আমি জানি আমি তোমায় কোনোদিন পাবো না—তবু—আমি বড় দুর্ব্বল—তোমায় এ কথা না ব'লে পারলাম না। আমার উপর তুমি রাগ কোরো না রমা। প্রথম যে সন্ধ্যায় তুমি আমার জীবনপথে উদয় হয়েছিলে সেইদিন থেকে তোমার চরণ-চিহ্ন আমার বুকে আঁকা হ'য়ে আছে। তুমি তো আমায় বন্ধু ব'লে স্বীকার করেছিলে—সেই বন্ধুত্বের দাবীতেও কি আমায় বলবে না! আমি তোমার কোথায় ব্যথা দিয়েছি?"

রমা কোনো উত্তর দিতে পারিল না—শুধু তাহার কান্নার বেগ বাড়িয়া গেল।

বিজয় ধরা গলায় বলিয়া চলিল, "জানতে সাধ যায় রমা—তুমি কি এ অভাগাকে একটুও মমতার চক্ষে দেখেছ—অথবা এভাবে তোমার দয়ার উপর আমি জুলুম করছি ব'লেই কি তুমি কাঁদছ? কিন্তু আমি কি রাস্কেল—আমি কি রকম ঘৃণ্য জীব, তা তোমার কাছে বল্‌তে আমার এখনও সঙ্কোচ! তা না ব'লেই আমি তোমার ভালোবাসা ভিক্ষা কচ্ছি! তবে শোনো রমা—"

হঠাৎ রমা দুই হাত তুলিয়া তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "বিজয়বাবু আমি কিছু জান্‌তে চাইনে—আমি তা শুন্‌ব না—"

রমার এ উত্তর তাহার প্রত্যাখ্যানের উপক্রমণিকা মনে করিয়া

বিজয়ের নৈরাশ্যে যেন দম বন্ধ হইয়া আসিল। সে শুধু বলিতে লাগিল—"থাক্—থাক্—একথা তোমায় জিজ্ঞাসা করা বাতুলতা তা আমি জানি—কিন্তু ঐ কথাটা আমায় দয়া ক'রে বল—কাঁদছিলে কেন—কি বেদনা তোমায় আমি দিয়েছিলাম। তুমি যে এখনো কাঁদছ?"

অশ্রু মুছিয়া রমা জবাব দিল "মানুষে কি কেবল দুঃখেই কাঁদে—"

মুহূর্ত্তে বিজয়ের বুক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের মত আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে রমার হাত দুখানি টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "তবে বল রমা, আমার মত হতভাগাকেও তুমি ভালোবাস—বল—"

মাথার উপরে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ—শীর্ণ, পাংশু—টুক্‌রা টুক্‌রা সাদা মেঘের আড়ালে অবিশ্রাম ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে এক পাল শেয়াল হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

রমা মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনি রাগ করবেন না, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি নে—বড় বোকা—কিন্তু আপনি এখনও টলছেন, আমার হাত শক্ত করে ধরুন।"

একটুকাল স্তব্ধ থাকিয়া বাধ্য শিশুর মত রমার হাত ধরিয়া বিজয় ধীরপদে পাথরের পর পাথর বাঁচাইয়া চলিতে লাগিল। চারিদিকে অসীম নিস্তব্ধতা। উহাদের পাশে কান পাতিলে শোনা যাইত উহাদের অস্পষ্ট পদধ্বনি, ওদের দ্রুত নিশ্বাসের আওয়াজ আর কিচ্ছু না।

উহারা মোটরের কাছে আসিয়া দেখিল—বৈজু গদির উপরে দিব্যি নাক ডাকাইতেছে। ফিরিবার পথে রমার বাবাকে তুলিয়া লইতে হইবে না, তিনি একাই বাড়ী ফিরিবেন বলিয়াছিলেন। পুঞ্জীভূত অন্ধকার দুই পাশে ঠেলিয়া গাড়ী ছুটিল। সিত্রোয়ঁার এঞ্জিন পাল্কীর মত, তার শব্দহীন গতি। অনির্ব্বচনীয় তুষ্ণী উহাদের দুইজনাকে ঘিরিয়া আছে। মিনিট পনের পরে রমাদের বাড়ীর দুয়ারে বিজয় ব্রেক কসিল।

রমা নামে—ধীরে। গাঢ় অন্ধকার তখন নামিয়াছে। স্থিরকণ্ঠে সে মাটিতে নামিয়া বলে, "একটু আগে মিছে কথা বলছিলুম, সেটা বোধ হয় আমাদের জন্মগত ছলনা প্রবৃত্তি—যাক্, নিজের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া ক'রে নিলুম। জানতে চাইছিলেন, ব'লে যাচ্চি—ভাল—বাসি। কিন্তু আজ আর নয়।" বলিয়া বাগানের ভিতর অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

হৃদ্‌পিণ্ড মানুষের এমন করিয়াও ধক্ ধক্ করে, মনে হয় যেন বুক ফাটিয়া যাইবে! বিজয় **steering wheel**এর উপর দুই হাত একত্র করিয়া তাহার উপরে অসাড়ে এক মিনিট মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, তারপর বৈজুকে জাগাইয়া দেয়!

১০

তিন দিন পরের কথা। রমার বাবা বাড়ীতে নাই, ড্রয়িং-রুমে দুইজনায় দেখা। বিজয়ের আর একদফা অতীত জীবনের জন্য অনুতাপের উচ্ছ্বাস শুনিয়া রমা বলিতেছিল, "দ্যাখো হিঁদুর বিয়েতে না স্বামী না স্ত্রী—কেউ-ই অতীত জীবনের **confession** ক'রে বিয়ে করতে পায় না! বিদেশী সাহিত্যে ওটা কিছুদিন আগে চল্‌ত বলে আমাদের অনেক নব্যতন্ত্রীরা ওটা **fassionable** মনে করতেন। এমন কি অন্নদাশঙ্কর রায়ও সেদিন "পুতুল নিয়ে খেলা" নামে একখানা পুস্তকে অতীত জীবনের স্বীকারোক্তির স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন। কিন্তু সেদিন থেকে তোমার আফ্‌শোষ শুনে অবধি আমি ভাবছি এ নিছক ভাববিলাসিতার দাম কতটুকু। তুমি যা ছিলে তা নিয়ে আমার কারবার নয়, তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ। আমার এই হ'লেই যথেষ্ট এখন থেকে

তুমি আমার, আমি তোমায় ভালোবাসব—এ ভালোবাসা হবে সূর্য্যালোকের মত ভাস্বর অনাবিল। যদি এ ভালোবাসা কোনোদিন মরে, তখন যেন হীন লুকোচুরির ভেতর দিয়ে এর শেষ না হয়; মাথা উঁচু করেই দুজনা যেন পরস্পরের কাছে বিদায় নিতে পারি। Confesson করার মানে তো এই—তুমি আমায় ঠকাতে চাও না তার প্রমাণ দেওয়া? কিন্তু তোমার মনে গলদ থাকলে ঐ স্বীকারোক্তিও শুধু নাটুকেপনাই হবে। অতএব আমি তোমার **further confession** শুনতে চাই নে।"

বিজয় রমার চিন্তাধারা দেখিয়া যেমন হইল বিস্মিত, তেমনি মানিয়া লইল তাহার যুক্তি। একটু মৌন থাকিয়া সে কহিল—"তোমার বাবার কাছে কথাটা তবে তুলি।"

"সে তোমার যেমন ইচ্ছা।"

"ইচ্ছে হয় আজই! এর চেয়ে আনন্দ আমার আ'র কিছুতে বেশী হোতো না—কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"—

"তোমার বাবা যে তোমার জন্য একটি বর ঠিক ক'রে রেখেছেন, আর তাকে তোমাদের বাড়ী আস্‌তেও লিখে দিয়েছেন সে খবর রাখ কি?"

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "নাঃ—!"

"আজই সকালে তোমার বাবা আমার সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন যে তোমার ভাবী বরের আস্‌বার খবর ও হেতুটা তোমায় এখনই দেবেন, কি পরেই সুবিধা মত দেবেন।"

"কিন্তু আপনি—তুমি এ খবরটা তো আমায় বল নি? আর লোকটিই বা কে?"—

"তোমার বাবা কতকটা গুপ্ত ভাবেই কথাটা আমায় বলেছিলেন। এখন বল্লাম, কারণ তোমার সঙ্গে একথার একটা মীমাংসা করার অধিকার

আমার এখন হয়েছে ; নইলে একথা তোমাকে হয়ত কোনোদিনই বলার দরকার হোতো না। আমি কতদিন ভেবেছি জানো রমা—আমি চক্রধরপুর ছেড়ে চলে' যাবো—তোমার জীবন আমার জীবনের সঙ্গে জড়াবার চেষ্টামাত্র কোরবো না। সেদিনও মূর্চ্ছান্তে যদি তোমার চক্ষের ভাষা আমায় পাগল ক'রে না তুল্‌ত তবে হয়তো কিছু বলা হোতো না। আমি তোমার বাবার কাছে এ খবর পেয়ে সংকল্প করেছিলাম দু'এক দিনের মধ্যেই এ জায়গা ছেড়ে যাবো—কিন্তু দৈবের অনুগ্রহে আজ আমার এ সৌভাগ্য, এ আঘাত আমার বিজয়ের রাজটীকা। কিন্তু যাক্‌ সে কথা। ছেলেটির নাম শুনেছি যতীশ দাশগুপ্ত—তোমার বাবার কোন বন্ধুর ছেলে। কেমিষ্ট্রিতে এম্‌-এতে প্রথম হয়েছে—সর্ব্ববিষয়েই সে আমার চাইতে তোমার যোগ্যতর পাত্র।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর বল তো বাবার ইচ্ছা কি ?"

তাঁর ইচ্ছা এই ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন। রূপে গুণে চরিত্রে বিদ্যাবত্তায় তাকে তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আজই সকালে এ অভিপ্রায় আমায় জানিয়ে বিকেল বেলাই যদি জান্‌তে পান যে তাঁর কন্যাটিকে আমি—আকিঞ্চিৎকর আমি—দখল করবার উপক্রম করছি তখন তিনি ব্যাপারটাকে কি রকম ভাবে নেবেন ?—বিশেষত আমি কায়েত, তোমরা বৈদ্য—সে বিষয়েও তাঁর কোনো আপত্তি উঠ্‌বে কিনা জানি না।"

"জাতি বিচার নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি—আমার যতদূর বিশ্বাস—না হবারই কথা। আর গরীব ব'লেও না।"

রমার বিশ্বাস সে দরিদ্র—যে মিথ্যা দিয়া সে পরিচয় সুরু করিয়াছে তাহা ভাঙিবে কবে, কিরূপে—মনে করিয়া হঠাৎ বিজয়ের বুকের মধ্যে 'ছাঁৎ করিয়া উঠিল। একবার ভাবিল তখনই সব খুলিয়া বলে—আবার

ভাবিল এখনই এত তাড়া কি—কোনো অসদুদ্দেশ্যে তো সে কথটা লুকাইতেছে না।

একটু ভাবিয়া বিজয় কহিল, "আচ্ছা তবু দু'চার দিন একটু ভেবে চিন্তে, আর তোমার বাবাকেও লক্ষ্য ক'রে নি—কি ভাবে বল্লে সব চাইতে সহজে তাঁর অনুমতি আমরা পেতে পারব। তোমার তাতে আপত্তি নেই বোধ হয়?"

"আমার আবার আপত্তি কি?"

সেদিন রমার পিতাকে কোনো কথা বলা হইল না। বিজয় কথামত রমাদের বাসা হইতে চা খাইয়া গৃহে ফিরিল। রমার পিতা বিজয়ের জখম হইবার কথা শুনিয়া রমা ও বিজয় উভয়কেই মৃদু ভৎর্সনা করিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া সে রাতে পিসিমাকে লুকাইতে পারিলেও পরদিন সকালে তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়া বিজয় 'দস্যুপনার' জন্য উৎকট বকুনী খাইল। বলা বাহুল্য পিসিমা আসল তথ্যের অতি অল্পই জানিতে পাইয়াছিলেন।

১১

আরো ছয় সাত দিন গেল। ইতোমধ্যে কলিকাতা হইতে ম্যানেজার ও বন্ধুবান্ধবদের চিঠির উপর চিঠিতে বিরক্ত হইয়া বিজয় তাহাদের মনে মনে মুণ্ডপাত করিতেছিল। কিন্তু সেদিন যখন ম্যানেজারের নিকট হইতে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম আসিল তখন তাহার মনে হইল একবার দুই চার দিনের জন্য কলিকাতা ঘুরিয়া আসা দরকার। কিন্তু চক্রধরপুর ছাড়া যে এত শক্ত হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিল সেইদিন—যেদিন সকালে কলিকাতা যাইবে স্থির করিয়া সুটকেস্ গোছাইতে বসিল।

বাক্স গোছগাছ করিয়া রমাদের বাড়ী বিদায় লইতে যাইবার পথে সে স্থির করিল রমার পিতার নিকট আজ সে কথাটা পাড়িবে; নইলে কবে যতীশ দাশগুপ্ত আসিয়া পড়িয়া গণ্ডগোল বাধায় তাহার ঠিক কি? কলিকাতা হইতে তো সে দিন-তিনেকের মধ্যেই ফিরিবে—তবু যদি···

রমার পিতার কাছে সে যাইয়া সংবাদ শুনিল—যতীশ দাশগুপ্তের বাপ চিঠি দিয়াছে, যতীশ পি-আর-এস্এর থিসিস লিখিতে সম্প্রতি একটু ব্যস্ত আছে, মাস দুই পরে চক্রধরপুর আসিবে। শুনিয়া বিজয় সেদিন কথাটা পাড়িল না। অথচ একদিন দুইদিন করিয়া নিজেই সে দিনটা যে পিছাইতেছিল তাহা সে রাস্তায় বাহির হইয়া হঠাৎ ঠাহর করিতে পারিল না। প্রস্তাবটা করিলেই, বিজয় দত্তের স্বরূপ বৃদ্ধ জানিতে পারিয়া যদি তাহাকে কন্যাদান করিতে রাজী না হন? কিন্তু সে ভয় তো চিরকালই থাকিবে।···তবু এ সুখস্বপ্ন যদি ভাঙেও তা যে কয়দিন পরে ভাঙে তাই ভালো। পিতার অমতে রমা তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে কি না সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল।

আসিবার সময় রমার চিবুক ধরিয়া বিজয় কহিল, "পারো তো আমায় এ-দু'দিনেই ভুলে যেও—"

রমা তাহার হঠাৎ এ যাত্রার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, কিন্তু পরক্ষণেই আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল "সাবধানে থেকো। আর যদিই আস্‌তে দেরী হয়, বাবার কাছে চিঠি দিও।"

বিজয় হাসিতে চেষ্টা করিলে তাহার কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিতেছিল। সে রমার হাত দুইখানি একত্র করিয়া তাহার উপর একটি চুম্বন দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ; তাহার শুধু মনে হইতেছিল—"সাবধানে থাকিও" অতি সাধারণ কথা—কিন্তু যতখানি বেদনা ও উৎকণ্ঠা লইয়া কথাটী উচ্চারিত হইল তাহাতো সাধারণ নহে। এতদিনে এমনই করিয়া সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে হর্ষে-বেদনায় তাহার জন্য ভাবিতে একজন মানুষ সত্যই কি বিধি মিলাইল ? ইহা কল্পনা করিতেও কি আনন্দ !

বিজয় চলিয়া গেলে যতদূর দেখা যায় রমা খিড়কি খুলিয়া তাহার দূরগামী দেহখানির পানে চাহিয়া রহিল ; পরে তাহা অদৃশ্য হইলে ছোট একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার এলোমেলো মনটাকে দুরস্ত করিতে বসিল।

রমা ভাবিতেছিল এ-রকম হয় কেন ? এই যে মাসেকের পরিচিত মানুষটি কলিকাতা গেল বলিয়া তাহাকে যেন সর্ব্বস্বরিক্ত করিয়া গেল—সে এখানে থাকিতেও দিনে কয়টি মুহূর্ত্ত বা তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত ? কিন্তু তাহাতে তো মনে স্বস্তির অভাব ছিল না ! আর থাকিবেই বা না কেন ? সে বাড়ীতে বসিয়া কল্পনা করিতে পারিত এখন বিজয় কি করিতেছে—হয়তো চা খাইতেছে, হয়তো বই পড়িতেছে, হয়তো শুইয়া আছে, হয় তো তাহারই কথা ভাবিতেছে। সে ভাবিত আর খুসী

হইতে পারিত। কিন্তু এখনও সে কি ভাবিতে পারে না? পারে বৈ কি? তাহাই তো তাহার সম্বল! কিন্তু তবু আড়াইশো' মাইল ব্যবধান মনে করিতেও যেন প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠে! যদি সে তিন্‌দিন পরে না আসে, যদি চিঠি না দেয়, যদি অসুখ বিসুখ হইয়া পড়ে, যদি কোনো আপদ-বিপদ হয়—আর সে এতদূরে—নাঃ সে পাগল হইল নাকি! আর মানুষে বুঝি দূরে যায় না?—যায় বৈকি—কিন্তু তাহার মতো এম্‌নি করিয়া কি সবাই ভালোবাসে—তাই তো তাহার এত ভাবনা এত দুঃখ—তাই তো তাহার এত সুখ! তাহার মনে পড়িল বাল্যকাল হইতে সে দুঃখ কাহাকে বলে জানে না, জানিত সে খুব সুখী—কিন্তু মনে হইতেছিল সে সুখ ছাই—কি সুখ ছিল? কি মূর্খ যে তখন সে মনে করিত তাহার মত সুখী নাই—কিন্তু আজ এ সুখের আস্বাদ না পাইলে তাহার জীবনটাই যে ব্যর্থ থাকিয়া যাইত! চিরকাল সে জানিত পাইয়া সুখ।—কিন্তু দিয়াও কি এত সুখ—সুখ—নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াও যে এত সুখ কে জানিত—বিজয়ের গায়ের একটি কাঁটা দূর করিতে তাহার বুকের শেষ রক্তবিন্দুও যে সাগ্রহ উৎকণ্ঠায় কেমন করিয়া কলরব করিয়া উঠে তাহা তো রমা আজ জানে।—জানে প্রিয়ের জন্য যে মরণ তাহা সত্যই স্বরগ সমান।—তাহার মনে পড়িল বিজয় তাহাকে কতবার চুম্বন দিয়া ভিক্ষুকের মত কেমন করিয়া তাকাইত—কিন্তু তাহার নীরব প্রার্থনার পুরস্কার তো কিছু সে দেয় নাই। কেন সে হতভাগিনী দেয় নাই—কেন এ লজ্জা তাহাকে প্রিয়তমা স্পর্শে আলিঙ্গনে এমন করিয়া পাইয়া বসে। কিন্তু বিজয় কি বোঝে নাই—যে বিজয় কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে মৃদু-মধু চাহনিতে তাহার সব জয় করিয়া লইয়াছে, সে কি বোঝে নাই যে কত সলজ্জ চুম্বন কতবার তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে গোপন অভিসারে আসিয়া চকিতে সরিয়া গেছে? একাকিনী বসিয়া একথা

ভাবিতেও তাহার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল যে এবার বিজয় ফিরিয়া আসিলে সে আর লজ্জার বাধা মানিবে না।

হঠাৎ বৈজু চাকর আসিয়া তাহাকে স্নানে যাইতে কহিয়া তখনকার মত চিন্তার পুষ্প-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া দিয়া গেল। রমা চুলের বেণী খুলিতে খুলিতে তখন পিতার কক্ষে গেল দেখিতে—তিনি স্নান করিয়াছেন কি না।

পরে দুই দিন কন্যার অন্যমনস্কতা ও বিমর্ষতা রমার পিতা লক্ষ্য করিলেন বটে কিন্তু কারণ ঠাওরাইতে পারিলেন না। সন্ধ্যাবেলা রমা স্কুল হইতে পড়াইয়া ফিরিলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"তোর স্কুলের কাজকর্ম্ম কেমন চল্‌ছে মা—"

"বেশ চলছিল বাবা—ইদানীং স্কুলের ভার সম্পূর্ণই প্রায় বিজয়বাবুই নিয়েছিলেন—আমি নামেমাত্র মাঝে মাঝে যেতাম।"

বৃদ্ধ ভাবিলেন এই প্রসঙ্গে কথাটা পাড়িয়া দেখা যাউক। বার দুই কাশিয়া তিনি কহিলেন—"শুধু স্কুলের ভার নয় মা—তোমার সমস্ত ভার নিতে পারে এমন একজন লোকের খোঁজে আমি অনেক দিন থেকে আছি—এবার মিলেওছে। সে শীগ্‌গিরই আমাদের এখানে আস্‌বে মা—"

রমা মুহূর্ত্তে সব প্রণিধান করিতে পারিলেও এবং বুকের মধ্যে হঠাৎ ধপ্‌ ধপ্‌ করিয়া হাতুড়ি পিটিতে সুরু করিলেও সে বিস্ময়ের সুরে কহিল "তার মানে বাবা—"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কথাটা তো আমি এমন কিছু শক্ত ভাষায় বলিনি মা। তোমার কাজের অষ্টপ্রহর সাহায্য করতে এই লোকটিকে ডাক্‌ছি—" বলিয়া হাতবাক্স হইতে একখানা ফোটোগ্রাফ বাহির করিয়া রমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

রমা ছবিখানা পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল "তা আমার তোমার

সাহায্য ছাড়া আর কারুর সাহায্যে তো কিছুমাত্র নেই বাবা”—বলিয়াই হঠাৎ তাহার মনে হইল কথাটা নিছক সত্য হইল কি না!

বৃদ্ধ কহিলেন, “আমাকে আর চিরদিন পাচ্ছ কোথায় মা—কিন্তু লোকটির চেহারা কেমন-লাগল তোমার বলতো—”

রমা ছবিতে প্রায় চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয় এক যুবার উন্নত প্রশস্ত ললাট, বলিষ্ঠ দেহ, জ্যোতি ব্যঞ্জক চক্ষু, গুম্ফরেখা সমন্বিত ওষ্ঠ ও কুঞ্চিত কেশ লক্ষ্য করিয়া বলিল—“চমৎকার”—মনে মনে বলিল, বাবার পছন্দের তারিফ করতে হয় কিন্তু তবু বিজয়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়।

বৃদ্ধ এবার হাসিয়া কহিলেন, “বাপ্‌রে ‘মন্দ নয়’ না—‘ভালো’-ও নয় —একেবারে ‘চমৎকার’।”

“চমৎকার বলেই চমৎকার বলছি—কিন্তু বাবা তোমার মতলবটা আমি কিন্তুই বুঝ্‌ছি না। ইনি কে-ই বা, কেনই বা চক্রধরপুর আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন—আমার কাজের সাহায্য করবেন—এরই বা মানে কি? এঁর ছবিই বা তোমার কাছে এলো কি করে?”

“যখন ‘চমৎকার’ মনে ধরেছে তখন বলেই ফেলি—এটি তোমার হবু-বর মা!”

রমা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, “কি?—”

কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, “যা বল্‌ছি সত্যি মা! বছর তিনেক আগে আমার বন্ধু অপরেশ এখানে একবার এসেওছিল যে তা তোমার নিশ্চয় মনে আছে—তোমায় ‘লক্ষ্মী-মা’ ব’লে ডাক্‌তে—তোমাকে তার ভারী মনে ধরেছে—সেই থেকেই তোমায় পুত্রবধূ করতে চান্। কিন্তু তোমার লেখাপড়ার জন্য আর বিশেষতঃ তোকে ছেড়ে থাকা মা যে আমার কি কষ্ট সেই ভেবে এতদিন—”

বৃদ্ধ হঠাৎ স্তব্ধ হইলেন—তাঁহাকে হঠাৎ ‘তুমি’ সম্বোধন হইতে হঠাৎ

'তুই' এ চলিয়া যাইতে দেখিয়া কন্যা বুঝিল যে কিসে তাঁহাকে এমন হঠাৎ স্তব্ধ করিয়া দিল—কিন্তু সে পিতার এ ভাবটাকে প্রশ্রয় পাইবার অবসর না দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সেই ভেবে এতদিন বাড়ী থেকে তাড়াও নি—তোমার মাকে, না বাবা ?—আজ আর তোমার কষ্ট হবে না, কেমন ?—আমার লেখাপড়ারও চরম উন্নতি হ'য়ে গিয়াছে, কেমন ?"

"কষ্ট আমার হবে কি না তা' অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু চিরদিন তোমাকে এ বুড়োকে পাহারা দিতে ধ'রে রাখতে পারি কি ক'রে ? বাপ-মা-এর অত স্বার্থপর হ'লে চলে না,—তা' নিজে যখন হবে তখন বুঝ্‌বে।—আর লেখাপড়া—তা তোমাকে আমি যে start দিয়ে দিয়েছি তা ভবিষ্যৎ জীবনে জ্ঞানচর্চ্চার বা অনুশীলনের জন্য যথেষ্টই মনে হয়। ইচ্ছা হয় তুমি নিজে বেশ পড়াশুনা করতে পারবে। অপরেশরা খুব উন্নত পরিবার। ওর ছেলে যতীশ গত বছর M. A. কেমিষ্ট্রিতে প্রথম হয়েছে, এবার পি-আর-এস দেবে। বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি ছেলেটী অতি নম্র বিনয়ী সচ্চরিত্র—"

রমার আর সহ্য হইতেছিল না সে বলিয়া উঠিল—"চমৎকার, একটি আদর্শ পুরুষ এবং কাজেই আমার মতো ওঁছা মেয়ের সঙ্গে বিবাহিত হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত! বাবা তুমি মানা. ক'রে লিখে দাও, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না—আমার বিয়ের দরকার নেই—"

রমা তাঁহাকে এত ভালবাসে মনে করিয়া বৃদ্ধ মনে মনে খুসী হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি সাদরে কন্যার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে কহিলেন, "তারপরে বুড়ো বাপ চোখ মুদ্‌লে তখন তোর কি উপায় হবে মা ?"

—"তা যা' হয় হবে—আমি বোধহয় কচি খুকী নই যে তখন একেবারে

জলেই পড়ব। না হয় তখন নেহাৎ একটা বিয়েই করা যাবে তোমায় নিশ্চিন্ত করবার জন্য।”

„আমি ম’লে তারপর তুই বিয়ে ক’রে আমায় নিশ্চিন্ত করবি মা ?—

“তা বৈকি, তুমি যেন স্বর্গে গিয়ে আমায় ভুলতে পারবে আর কি ? তাই ভেবেছ কি না ?”

তখনকার মতো কথাটা স্থগিত রাখিতে সংকল্প রমার পিতা কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন—“আচ্ছা ও কথা এখন থাক। যতীশ মাস দু’য়েকের আগে তো আর এসে পৌঁছোচ্চে না, পি-আর-এসের thesis দিয়ে আস্‌চে, মাস দু’য়েক লাগবে লিখেছে—”

“বাঃ, তুমি এর মধ্যে নিমন্ত্রণ ক’রে-টরে সেরেছে—কিন্তু বাবা তোমার ক্ষ্যাপা মেয়েকে তো জানো—এ বিয়ে তো কিছুতেই হ’তে পারবে না—” ঝোঁকের মাথায় এত ঝাঁজের সঙ্গে সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। বলিয়া সে একটু লজ্জাই পাইল।

পিতা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন “কিছুতেই হ’তে পারে তা কেন মা ? বেচারার অপরাধ ?”—

রমা এ প্রসঙ্গ উঠিব মাত্রই বিজয়ের উপর মনে মনে রাগ করিতেছিল—সে যদি সব কথা পিতাকে কহিযা যাইত তবে তো সে এ মুস্কিলে পড়িত না।

পিতার প্রশ্নের উত্তরে তাড়াতাড়ি তাহার মুখে যে উত্তর জোগাইল সে বলিয়া ফেলিল—“এতক্ষণ ধরে, তোমায় কি বল্লাম বাবা ?—তা’ ছাড়া এখনি গিয়ে হাঁড়ি-ঠেলার পালা আমার পোষাবে না।”

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “হাঁড়ি ঠেল্‌তে তোমার তো কোনোদিন বিতৃষ্ণা দেখিনি মা। রাঁধুনি ঠাকুর তো মাসের মধ্যে বিশ দিন বসেই থাকে—শুনি তুমিই তাকে হেঁসেলে ঘেষ্‌তে দাও না! হাঁড়ি না ঠেলে যখন সুসভ্য মানুষের কাঠাম খাড়া রাখা চলে না তখন সেদিক গৃহকর্ত্তার

ও কর্ত্রীর অবশ্য দৃষ্টি দিতে হবে বৈকি—বরং পরের উপর এসব তুচ্ছ বিষয়ের জন্য যত কম নির্ভর করা যায় ততই ভালো—এসব কথা না তুমিই নিজে বল—"

রমা নিজের কথায় নিজে ঠকিলেও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "বেশ করি।"

"আর এও তো তোমারই মত মা—যে পুরুষ যখন স্বভাবতই বাইরের কাজের বেশী উপযুক্ত, তখন ঘরোয়া কাজগুলা বিশেষভাবে মেয়েদের ভাগেই পড়া উচিত ?"

"আর বক্‌তে পারিনে বাবা। ঘরোয়া কাজ আমার ভাগেই পড়া উচিত, কিন্তু সে তোমার সংসারে—আর কোথাও নয়। কিন্তু এবার তুমি ওঠো তো—অনেক রাত হয়েছে খেতে যাবে চল।"

উত্তরে বৃদ্ধ সুপ্রচুর হাস্য করিয়া খাইতে উঠিলেন।

১২

বিজয় তিন চার দিন পরে ফিরিলে রমা তাহাকে সব কথা বলিয়া জানাইল যে তাহার পিতাকে যেন সে শীঘ্রই কথাটা বলিয়া ফেলে। ইতোমধ্যে বিজয়ের পিসিমার দাঁতের কি ব্যথা হওয়ায় বিজয়কে বাড়ীর খবরদারী করিবার জন্য চক্রধরপুরে রাখিয়া কলিকাতায় দাঁত তোলাইবার জন্য তিনি দিন পনেরোর জন্য চলিয়া গেলেন। ভার করিয়া ষ্টেটের দেওয়ানকে আনাইয়া তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

বিজয় দেখিল এই সুযোগ যায়। পিসিমা এখনই খবরটা জানেন ইহা তাহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি চলিয়া যাইবার দিন তিন চার পরে একদিন

সকালবেলা সে বিহিত প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য রমার পিতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। গিয়া দেখিল পিতাপুত্রীতে সাংসারিক কি কথাবার্ত্তা হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে রমা কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলে দুই-পাঁচটা একথা সে-কথার পর বিজয় কহিল, "আজ সকালে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি—আমার একটা নিবেদন আছে—"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন—"কি ?"

বিজয় নতমুখে মিনিটখানেক আঙুল খুঁটিয়া মুখ না তুলিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী ; যদি আপনার অভিমত হয়—তাঁকে আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক।"

বৃদ্ধ এ প্রস্তাবের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না ; কথাটা শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন। পরে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে যেন ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি কথা কহিলেন।

"তোমার কথা শুনে আমি কি জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছি না বিজয়। প্রথমতঃ রমার এ সম্বন্ধে কি মতামত আমার জানতে হবে। দ্বিতীয়তঃ—যতীশ, যার কথা সেদিন তোমায় বল্‌ছিলাম—রমা সম্বন্ধে তার বাপকে একরকম কথা দিয়ে ফেলেছি বল্লেই হয়। তৃতীয়তঃ তোমাদের বিবাহে একটা প্রকাণ্ড সামাজিক বাধা আছে। তোমরা কায়েত আমরা বৈদ্য ; অথচ তোমরাও হিন্দু, আমরাও তাই। এ বিয়ে হ'লে হিন্দুধর্ম্ম বা শাস্ত্রের যদি বা সয়—সমাজের সইবে না। সমাজের বাইরে গিয়ে থাকতে যে ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র স্বীকার এবং সাহস দরকার হয়—তা তোমরা উভয়েই বরণ ক'রে নিতে পারবে কিনা এবং সানন্দে বরণ করতে পারবে কিনা তাও ভাবতে হবে। চতুর্থ কথা হচ্ছে এই যে, তুমি বলছো তুমি গরীব। অবশ্য গরীব ব'লেই আমার কোনো আপত্তি নেই—কিন্তু রমার অভিভাবক

হিসাবে আমার সব দিক দেখেই কাজ করতে হবে একথা তুমি অবশ্যই বোঝো ; বিশেষতঃ সমাজে একঘরে' হয়ে' থাক্‌তে হ'লে যে সব অসুবিধা ঘটে, অর্থের প্রাচুর্য্য থাক্‌লে তার কতকটা আসান হয়। এ অবস্থায় তোমাদের অর্থসঙ্গতিও—এ বিবাহে মত দিতে হ'লে—অবশ্যই একটা বিবেচনার বিষয়। এই সব কথা বিশেষ ক'রে না ভেবে তোমায় আমি কথা দিতে পাচ্ছি নে। কাল যদি তুমি সকালবেলায় একবার আস তবে তোমাকে আমি আমার সঠিক মত জানতে পারব।"

বিজয় একবার মুখ তুলিয়া বৃদ্ধের পানে চাহিয়া বলিল, "আপনার কথার যুক্তি আমি অস্বীকার করতে পারব না—কিন্তু এ সন্দেহের দোলায় কাল পর্য্যন্ত থাকতে যে আমার কি অবস্থা হবে তা আপনাকে ব'লে আমি বোঝাতে পারব না। সমাজ তো কোন্ ছার, সারা বিশ্বের সমস্ত গ্লানি আমি আপনার কন্যার জন্য মাথা পেতে নিতে রাজী আছি। আর আমার আর্থিক অবস্থা এত খারাপ হয় তো নয়—যে আমাদের দুইটী প্রাণীর স্বচ্ছলতার অভাব হবে। আমাব অন্য স্বজন পোষ্য নাই বল্লেই হয়। আমার—" কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া বিজয় বলিল, "বাজে বকে আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না; আমি আসি এখন। কাল সকালে আস্‌ব—" এবং কি মনে করিয়া সেদিন হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া কহিল, "আপনি আমাকে এ কয়দিনের পরিচয়েই যথেষ্ট স্নেহ করেন জানি—তাই আমিও বিশ্বাস করি এ অদ্ভুত আচরণ আমার আপনি ভুল বুঝ্‌বেন না। আজকে আপনার মত পিতৃপ্রতিম-জনের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না ক'রে আপনার সম্মুখ দিয়া যেতে পারলাম না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়—" বলিয়া কাঁপিয়া-আসা কণ্ঠস্বর লুকাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে করিতে ত্বরিত পদে বিজয় ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বস্তুতই বিজয়কে ভালোবাসিয়াছিলেন। বিজয় চলিয়া গেলে তিনি মৃদু হাসিতে হাসিতে মিনিট দশেক চুপ করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা টেবিলের কোণায় আস্তে আস্তে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, "রমা—মা !"

"যাই বাবা"—বলিয়া সাড়া দিয়া রমা মিনিট পাঁচেক পরে সত্যহল্‌দী-মাখা হাত ধুইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধের ওষ্ঠের হাসি মিলাইল না—কন্যার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "বিজয় তো তোকে বিয়ে করতে চায় মা—"

হঠাৎ পিতার দ্বারা এইরূপ আক্রান্তা হইয়া রমা লজ্জায় বিষম লাল হইয়া উঠিল—পিতার কথার উত্তরে কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

পিতা আবার কহিলেন, "সাহায্যকারীর পদের জন্য এর আবেদন হয়তো অগ্রাহ্য হবে না, কি বলিস্ মা—"

"আমি কি জানি তার—"

বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন "নাঃ তুই কিচ্ছু জানিস্ না। হাঃ হাঃ—এই জন্যই অপরেশের ছেলের সঙ্গে বিবাহের কথায় 'কিছুতেই বিয়ে হতে পারবে না' বলেছিলি। কিন্তু মা এখন বোধ হয় আমায় একা ছেড়ে যেতে কোনো আপত্তি হবে না ?"

"একশো বার হবে হাজার বার হবে—তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—কোথাও না।"

"বিজয়ের বাড়ী গিয়ে আমি আস্তানা গাড়ব, কেমন ?"

"তা যদি হয়ই বাবা—তখন শুধু সেটা বিজয়বাবুর বাড়ী তো থাক্‌বে না—তোমার মেয়েরও বাড়ী হবে। তুমি তো জান না যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এমন কেউ নেই যে তোমার বই আর তানপুরা সাধনার কেউ প্রতিবন্ধক হবে—আর না হয় আমি তোমরে কাছেই থাকব !"

"বা চমৎকার কথা—পাগলীর মতোই কথা বটে ! বিয়ে ক'রে উনি

স্বামীর ঘর করবেন না, আমায় পাহারা দেবেন! তারপর বিজয় লাখ টাকার জমিদার নয়; হাঁড়ি ঠেল্‌তে যদি শেষে হয়?”

রমা ততক্ষণ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। পিতার সম্মুখে সে কোনোদিন সঙ্কোচ বোধ করিতে অভ্যস্ত নয়। এতক্ষণে বেশ সপ্রতিভের মতোই জবাব দিল, “তা’ এতদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে বিজয়বাবুর জন্য সেটুকু কষ্ট স্বীকার করতে আমি রাজী আছি, অবশ্য তুমি যদি তোমার রাঁধুনীকে আজ্ঞা দাও।”

বৃদ্ধ উচ্চৈস্বরে একদফা প্রচুর হাস্য করিয়া পরে একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “এবার তোমায় একটা দরকারী কথা বোল্‌ব মা, ভেবে-চিন্তে জবাব দিও। বিজয় কায়েত ব’লে তার সঙ্গে তোমার বিয়েতে যে সামাজিক প্রতিবন্ধক একটা হবে তা বুঝতেই পাচ্ছ—হিন্দুসমাজে থেকে সেটাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। এ বিয়ে হ’লে তোমরা সমাজচ্যুত হবে; তজ্জনিত যে অস্বস্তি তা তোমরা হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারবে কি? —দাঁড়াও—ভাল ক’রে শুনে নাও মা—এর মধ্যে তোমাদের জীবন ছাড়া আরও আনেকের ইষ্টানিষ্ট জড়িত আছে। এ বিবাহের ফলে তোমাদের সন্তানাদি যদি কিছু হয়, তাদের বিবাহাদি নানাবিধ সামাজিক ব্যাপারে তোমাদের বিষম বিপদে পড়তে হবে। তোমাদের এখন যৌবনের টাট্‌কা গরম রক্ত—এ সব কথা আমলেই আন না—কিন্তু আমরা দেখে শিখেছি কিনা—বহু দেখেছি, এ-রকম বিয়ের ফলে শেষকালে ছেলেমেয়ের বিবাহাদি নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়্‌তে হয়। তবু যাদের টাকা আছে তাদের বিলেত-ফেরত সমাজ-টমাজে চলে যায়; কিন্তু যাদের পয়সা নেই তাদের মহা মুস্কিলে পড়্‌তে হয়;—ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু জানো তো মা, ব্রাহ্মদের সঙ্গে যদিও আমার কোনো বাদ নেই, তবু হিন্দুধর্ম্মই আমার স্বধর্ম্ম। তার বাহাড়ম্বর আমায় পতিত ব’লে

চেঁচামেচি করলেও আমি তা মেনে নিয়ে তাকে রাগ ক'রে ছেড়ে যাবো কেন—আর রাগ ক'রে না যাই—নিজের স্থবিধের জন্মই বা ছেড়ে যাবো কেন?—বরং হিন্দুসমাজকে আমাকে ন্যায়পরতার দাবীতে গ্রহণ করতে বাধ্য ক'রব—অন্ততঃ করতে চেষ্টা ক'রব। তোমার বর্ত্তমান যে মত তাতে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বা গা বাঁচিয়ে চলার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হ'তে নিশ্চয় রাজী হবে না এবং তা' যদি না হও এ সমস্যার সমাধান কি ক'রে করবে?"

রমা স্থিরভাবে সব শুনিয়া জবাব দিল, "বাবা, সমাজ ব্যক্তিগতভাবে আমায় কি শাস্তি দেবে না দেবে তার বিন্দুমাত্র চিন্তা আমি করি না। আর তুমি পরে যে কথা বল্লে তার একমাত্র জবাব আমার হচ্ছে এই—যে কন্যাপুত্র যদি ভগবান আমাদের দেন তো তাদের শিক্ষা দেবো তো আমরাই? তারা যদি মানুষের মতো মানুষ হয় তাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীর অভাব এখন দেশে হবে না—সমাজের চীৎকারে তাতে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক ঘটাতে পারবে না—এমন যদি নাই হয় তারা—একটা আদর্শের জন্য উৎসর্গিত হবে—তাতে আমার আনন্দ বই দুঃখ হবে না।"

"আদর্শের জন্য ছেলেমেয়েরা উৎসর্গিত হ'লে আনন্দিত হবে বল্‌ছ রমা—কিন্তু এ উৎসর্গের যে মূল্য কি—তা হয়তো ভাল ক'রে প্রণিধান করতে পারছ না মা—"

"ঠিক বুঝেছি বাবা—আমাদের এ বিবাহে যদি এমন কোনো অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হয়—তুমি কি মনে কর তোমার মেয়ে তা সইতে পারবে না? কর্ত্তব্যের খাতিরে একটু কষ্ট সহ্য করা কিছুই নয় বাবা।"

বৃদ্ধ এবার কন্যাকে টানিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "আর আমার কিছু বল্‌বার নেই এর ওপরে। কাল তবে বিজয়কে কথা দিয়ে দি?"

রমা উত্তরে কথা না বলিয়া পিতার বক্ষে মুখ লুকাইল। দুই হাতে কন্যার মাথা বুকে চাপিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া বৃদ্ধ অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা কে কাকে বেশী ভালোবেসে ফেলেছিস মা ?”

রমা বুক হইতে মাথা না সরাইয়া পিতার পানে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিল।

সেইদিন অপরাহ্নে রমা একা বসিয়া ভাবিতেছিল: এই সেদিন বিজয়ের সহিত তাহার কথা কাটাকাটি হইতেছিল—সমাজ সংস্কারকেরই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত কিনা! আজ সে-ই কিনা বিদ্রোহের পতাকা ধরিতে যাইতেছে! ইহার ফল কি হইবে কে জানে ? —কিন্তু তাহা ভাবিয়া কি হইবে, সে তো সমাজ-সংস্কারক হইবার স্পর্দ্ধা রাখে না। সে জানে সমাজের অনুশাসন এ স্থলে মানিয়া কোন স্বজাতীয়কে বিবাহ করিলে তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইবে—নয় তো যদি সে কুমারী থাকে তার ব্যক্তিগত জীবনে সুখ জ্ঞান কর্ম্ম ও আত্মোপলব্ধির দিক দিয়া এমন একটা লোকসান হইবে যাহার ক্ষতিপূরণ সমাজের ঠুন্‌কো পবিত্রতার বড়াই শতবর্ষেও বিন্দুমাত্র করিতে পারিবে না। তবে—তবে ?

পরদিন সকালে যাইয়া বিজয় রমার পিতার সম্মতি পাইল। তারপর বিবাহ সম্বন্ধে দু'চার কথা হইবার পর বৃদ্ধ রমাকেও সেখানে ডাকিলেন ; কারণ তাহাদের উভয়ের বিবাহের কথাবার্তায় উভয়ের উপস্থিতি তিনি উচিত বোধ করিতেছিলেন। রমা ঘামিতে ঘামিতে আসিয়া পিতার এক পাশে বসিল ; কিন্তু আজ হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ঘাড় তুলিয়া সপ্রতিভভাবে পিতার সম্মুখে বিজয়ের পানে তাকাইতে পারিতেছিল না। বৃদ্ধও তাহাকে কোনো প্রশ্ন করিয়া বিব্রত না করিয়া বিজয়ের সহিতই মাত্র কথা কহিতেছিলেন, রমা শুনিয়া যাইতেছিল মাত্র।

কথায় কথায় বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—কোন্ প্রথানুযায়ী এবং কোন্ শাস্ত্রমতে এ বিবাহ সম্পন্ন হবে ?"

বিজয় চট্ করিয়া জবাব দিল, "তা আপনাদের যা খুসী, আমার কোনো পদ্ধতিতেই এবং কোনো মতেই বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

"বাঃ—কোন্ পদ্ধতিতেই বিয়ে হ'লে ভালো হয়, এ বিষয়ে তোমার ব্যক্তিগত মত বা ইচ্ছা কিছু নেই ?"

"না—হ্যাঁ—একেবারে নেই বলি কি ক'রে ? আমি রেজেষ্ট্রী করা ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন আছে ব'লে অনুভব করি না এবং সে রেজেষ্ট্রিও ইংরেজের আইনে দেশ চল্‌ছে বলেই তার চক্ষে বিবাহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য—নইলে রেজেষ্ট্রিরই বা দরকার কি ? স্বাধীনভাবে হৃদয়ের অবাধ বিনিময় এবং আত্মীয় প্রতিবেশীর সাক্ষ্য ও শুভ ইচ্ছাই আমার মনে হয় বিবাহের বন্ধন সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট।"

রমার পিতা বিস্ময়ের সুরে কহিলেন—"বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামত

শুনে খুসী হতে পারলাম না বিজয়। বিবাহটাকে কি তুমি একটা সামাজিক বিধান মাত্র বলতে চাও? স্বামী স্ত্রীর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে কি এর কোনো সম্বন্ধ তুমি স্বীকার কর না?"

বিজয় সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—"এ আশঙ্কাই আমি করেছিলাম এবং এ বিষয়ে আমি আপনার বিরক্তির কারণ হ'য়ে অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়েছি। কিন্তু এ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় কাজ কি?—আমি তো বলেছি রমাদেবী ও আপনার তুষ্টির জন্য আমি যে কোন পদ্ধতির বিবাহেই রাজী আছি।"

রমার পিতা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "এ কথা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমার জানবার প্রয়োজন আছে। ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাহের কোন সম্বন্ধ নেই তুমি বল্‌তে চাও?"

"কিছুমাত্র নেই একথা বল্‌তে চাইনে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে স্বেচ্ছায় সত্যের সন্ধানে যতটা সাহায্য করতে চায় এবং পারে—ততটাই মাত্র ধর্ম্মের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। পরস্পরকে সাহায্য করবার ইচ্ছা যদি লোপ পায়—আমার মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের তখন বিন্দুমাত্র কোনো মূল্য থাকে না। তখন তাদের পৃথক বাস করলে কিছুমাত্র লোকসান নেই, বরং ভালোই; কারণ তাতে উভয়ের দৈনন্দিন মানসিক দ্বন্দ্ব একটা খারাপ নরকের সৃষ্টি করে; তার ফলে হয় কেবল ভাণ, কেবল মিথ্যা, কেবল প্রবঞ্চনা।"

"তবে আমি যা' ধারণা করেছিলাম তাই ঠিক;—তোমার মতে বিবাহ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটা বিধান মাত্র?"

"আজ্ঞে তাতো বটেই; কিন্তু ঐ যে বল্লাম ইহজীবনে তারা সত্যানুসন্ধানে পরস্পরের সাহায্যকারীও—কিন্তু নিছক সাহায্যকারী মাত্র, পরস্পরের ন্যায়-অন্যায়ের ভাগী নয়। প্রত্যেকের ভালো-মন্দ, শুভাশুভ,

জ্ঞান অজ্ঞানতা, তার নিজেরই মাত্র সম্পত্তি, অন্যে তা বাড়াতেও পারে না কমাতেও পারে না। রত্নাকর দস্যুর স্ত্রীও এমনি একটা কথাই কি বলেছিল না ?"

বৃদ্ধ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বিজয়ের কথা শুনিয়া কহিলেন, "সত্যানুসন্ধানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সাহায্যকারী বল্‌ছিলে, কিন্তু সত্যানুসন্ধান জিনিষটা কি ? ভগবানের কৃপালাভ ?"

বিজয় লক্ষ্য করিয়াছিল যে বৃদ্ধ উত্তোরত্তর অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িতেছেন এবং ইহাও বুঝিতেছিল—বৃদ্ধের স্বীয় চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের উপর তাহার কথাগুলা অত্যন্ত আঘাত করিতেছে ; তাহাতে যে সে ভীত হইয়া না উঠিতেছিল এমন নহে। একবার ভাবিল বৃদ্ধের কথায় নির্ব্বিবাদে সায় দিয়া যায়—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল —না। পরিচয়ের প্রারম্ভেই মিথ্যাভাষণের ফলে সে যে মুস্কিলে পড়িয়াছে তাহা তো দেখিতেছেই—আবার এখন মিথ্যাভাষণে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তদ্ভিন্ন সে মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত নহে—সত্যবাদিতা তার একটা গুণই ছিল। শুধু কি একটা খেয়ালে প্রথম দিন একটা মিথ্যা বলিয়া এখন এই মুস্কিলে সে পড়িয়াছে। আজ আবার মিথ্যাচরণ—আজ রমাকে ভালবাসিয়া রমার সাম্‌নে, রমার পিতার কাছে ?

রমার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যানুসন্ধান মানে সে কি বোঝে—'ভগবানের কৃপা লাভ' কি ? উত্তরে তাহার বলিতে ভয় হইতেছিল—সে ভগবানের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না—আবার তাঁর কৃপালাভের জন্য ব্যস্ত হইবে ! কিন্তু উত্তর না দিয়াও উপায় নাই— তাই সে ধীরে ধীরে বলিল, "আজ্ঞে না, ভগবানের কৃপালাভ সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য নয়—ভগবান বলে কিছু আছে কিনা তারি অনুসন্ধান. বরং একটা সত্যানুসন্ধান বলা যেতে পারে।"

এবার বৃদ্ধের মুখ চোখ লাল হইয়া গিয়াছিল। ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া তিনি কহিলেন, "তুমি তাহলে নাস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না ?"

বিজয় তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সভয়ে একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল;—দেখিল উজ্জ্বল কঠোরদৃষ্টিতে বৃদ্ধ তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। পরক্ষণেই তাহার দৃষ্টি রমার মুখের উপর পড়িল—দেখিল যে-রমা এতক্ষণ মৃত্তিকায় দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া ছিল—এইবার সেই রমা সংশয়াকুল আগ্রহে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। বিজয় দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মুহূর্ত্তপরে মাটির দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান।"

বৃদ্ধ এবার কি বলেন শুনিবার জন্য বিজয় মাটির পানে চাহিয়াই উৎকর্ণ হইয়া রহিল--তাঁহার মুখের পানে চাহিতে যেন তাহার সাহস হইতেছিল না। মিনিট পাঁচেক ঘরের সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ—দেওয়ালের ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ তখন বিশেষ করিয়া কানে বাজিতেছিল। তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধ কহিলেন, "আর বেশী কথায় কাজ নেই। নাস্তিকের সঙ্গে আমি রমার বিয়ে দিতে পার্‌ব না।"

বৃদ্ধের উক্তি শুনিবামাত্র রমা ও বিজয় উভয়ের মুখ যুগপৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। বিজয় ভীত হইলেও এ নিদারুণ উত্তর শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুক্ষণ কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিল না। বৃদ্ধ নিজেই আবার কহিলেন, "আমি যে-কোনো জাতির যে-কোনো লোকের সঙ্গে রমার সুখের জন্য তার বিয়ে দিতে পারি—কিন্তু নাস্তিকের সঙ্গে আমি বিয়ে দেবো না; কারণ যারা কৃতকর্ম্মের জন্য ভগবানের কাছে নিজেদের দায়ী মনে না করে, তারা না করতে পারে এমন কুকাজ পৃথিবীতে নেই—"

বিজয় এবার কহিল, "দেখুন নাস্তিকেরাও নিজেদের দায়ী মনে করে

তাদের অন্তর্নিহিত ভালোমন্দ জ্ঞানেব কাছে এবং সেই জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করে স্বাধীন-যুক্তি প্রণোদিত স্বাভাবিক বিচারবোধ—”

বৃদ্ধ অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের স্বাভাবিক বিচারবোধের দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি। কুকার্য্য সমর্থন করবার জন্য মনগড়া কতকগুলি যুক্তি দাঁড় করিয়ে নাস্তিকেরা অহরহ মনকে চোখ ঠেরে চলে!”

“আজ্ঞে তা কেবল নাস্তিকেরাই চলে না, সকলেই অল্পবিস্তর তা’ চলে। কিন্তু বিবেককে চোখ ঠেরে আস্তিক নাস্তিক এ দু’দলের কেউ চল্‌তে পারে না। সে ঠিক জায়গায় খচ্‌-খচ্‌ ক’রে বিঁধবেই। তবে জানেন কি, বিবেক জিনিষটাও মনের মধ্যে গড়ে’ তোলবার কর্ত্তা হচ্ছে সমাজগত সংস্কার। সেই সংস্কারের বিপরীত কোনো ব্যাপারকে যদি যুক্তির তৌল-দাঁড়িতে মেপে কেউ নির্ভীকভাবে অকুণ্ঠিতচিত্তে ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করতে পারে, তাকে কেউ হয় তো গালাগালি করতে পারে, কিন্তু আমি তাকে ঐ নিষ্ঠাটুকুর জন্য—যেটাকে সে সত্য ব’লে বুঝেছে তার প্রতি ঐ ঐকান্তিক রতিটুকু জন্য—শ্রদ্ধা না ক’রে পারব না।”

“বাঃ খাসা যুক্তি—চোরে চুরি ক’রে যদি যুক্তির তৌল-দাঁড়িতে মেপে তোমার কথামত ঠিক ক’রে বসে যে তার কাজটা মোটেই গর্হিত নয়—তাহলে তাকেও শ্রদ্ধা ক’রতে হবে, কি বল?”

“আমি নিশ্চয় করব, যদি সে কোনো কারণে নির্ভীকভাবে নিষ্ঠার সহিত এ ধারণা বজায় রাখতে পারে, যদি তার অনুশোচনা না হয়। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন এ রকম চোর লক্ষে একটা মেলে; তাকে প্রশংসা করতে হবে ব’লে চৌর্য্যবৃত্তিটাকে প্রশংসা করতে হবে তার মানে নেই। ডাকাতিটা ভালো জিনিষ নয়, কিন্তু দেবী-চৌধুরাণী ডাকাতি করতেন বলে তাঁর প্রতি কারুর শ্রদ্ধা কম নয়। হিংসা করা অন্যায়, কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনের

জন্য অর্জ্জুনকে স্বজন-হনন করতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন। অন্যায়টা যে কখন কি রকম ক'রে ন্যায় হয়ে দাঁড়ায়, আর ন্যায়টা যে কখন কি রকম ক'রে অন্যায় হ'য়ে দাঁড়ায়—তার ঠিক-ঠিকানা করা বড়ই শক্ত—শক্ত কেন অসম্ভবই বোধ হয়; নইলে দুনিয়ার বৈচিত্র্যই চলে যেতো।"

উষ্মার সহিত বৃদ্ধ এইবার জবাব দিলেন, "তোমার বাক্‌চাতুর্য্য প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির ক'রে ফেলেছি—নাস্তিককে আমি কন্যা দান ক'র্‌ব না।"

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমার সত্য সরল মতাভিব্যক্তির জন্য এত বড় শাস্তি আমায দেবেন না। আর এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি—যে রমা দেবীকে লাভ করবার জন্য আপনাদের অনুমোদিত যে কোনো পদ্ধতিতে আমি এ বিবাহ করতে রাজী আছি।"

বৃদ্ধ বিদ্রূপের স্বরে উত্তর করিলেন, "তা রাজী আছ বটে—যেন প্রয়োজন মত তোমাদের স্বাভাবিক যুক্তির দোহাই দিয়ে এ বন্ধনটাকে নাকচ ক'রে আমার মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিতে পার—"

বিজয়ের রক্ত এবার উষ্ণ হইয়া উঠিল। রমার পিতা বলিয়া ও বয়সে বৃদ্ধ বলিয়া সে যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করিয়া কথা কহিতেছিল, কিন্তু এবার সে অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখুন—আপনি ইচ্ছা করলে আপনার কন্যাকে আমায় সম্প্রদান না করতে পারেন, কিন্তু আমায় এম্‌নি ক'রে অপমান করবার অধিকার আপনার আছে কিনা আপনি পরে একবার ভেবে দেখ্‌বেন। যে কোন পদ্ধতিতে বিবাহে রাজী হয়েছিলাম ব'লে মনে করবেন না—সব পদ্ধতিতেই আমি স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বিবাহের মুহূর্ত্তে বিশ্বাস করবার ভাণ ক'রে পরমুহূর্ত্তেই তা ভুলে যেতাম। যে কোনো পদ্ধতিতেই বিবাহ হোক, আমি জানতাম

প্রত্যেকটাতেই প্রকার ভেদ কতগুলা প্রতিজ্ঞা করা মাত্র—সে প্রতিজ্ঞা আপনারা শালগ্রাম শিলা বা পরমেশ্বরকে সাক্ষী রেখে করতেন—আমি তা' আমার অন্তর দেবতাকে সাক্ষী রেখে করতাম। স্থির জান্‌বেন, রমাদেবীর জন্য যে কোন প্রতিজ্ঞা আমি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট-চিত্তে করতে প্রস্তুত ছিলাম এবং তা পালন করতে এত চেষ্টা করতাম যা ধ্বজাধারী আস্তিকের মধ্যে খুব কম লোকেই করে। যাক আমি আপনার চরম আজ্ঞা পেয়েছি, এবার বিদায় হই। অপরাধ যা' কিছু আমি করেছি ক্ষমা করতে চেষ্টা করবেন।" বলিয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ রমার পানে একবার তাকাইয়া কহিয়া গেল, "রমা দেবী, আমার যত ত্রুটি আজ মাপ করবেন—এ দাবী আপনার কাছে আজ আমি ক'রেই যাব।"

বিজয় বাহির হইয়া গেল বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে শাড়ীর খসখস শব্দে চাহিয়া দেখিলেন রমা উঠিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে। ডাকিলেন, 'রমা-মা!' কন্যা উদ্যত অশ্রু গোপন করিতে করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। হাতছানি দিয়া তাহাকে পুনরায় ডাকিতে সে গিয়া পিতার পাশে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া অনর্থক বিছানার চাদরের একটা সূতা ছিঁড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ আরো মিনিট পাঁচেক পরে বলিলেন, "মা, সত্যই আমি তাকে অন্যায় আঘাত করেছি! কিন্তু আমার কি আশা সে আজ ভেঙেছে মা, তা তুমিও বুঝ্‌বে না। তাকে আমিও স্নেহ করতে সুরু করেছিলাম। বড় আশা ক'রে কাল থেকে আছি, তোমার মনোমত পাত্রের হাতে তোমায় দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা দেখছি অন্যরূপ। একদিন দেখ্‌বো মা, আজ যা আমি করলাম তার ফল ভাল বই মন্দ হবে না এবং তোমারি জন্য তোমারি মুখ চেয়ে আমি তার হাতে তোমায় দিতে রাজী

হতে পারি নি।” একটু থামিয়া বলিলেন, “মা তুমি রাগ করনি?”

অশ্রুসজল-চক্ষু পিতার চক্ষে পাতিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া রমা বলিল, “তুমি কি যে বল বাবা, তার ঠিক ঠিকানা নেই। তোমার উপর রাগ করতে পারি আমি? তুমি কোনোদিন ভুল করতে পারো না বাবা, —ভগবানের এই-ই অভিপ্রায় ছিল। তুমি যা' করলে এতেই আমার ভালো হবে। আমার কথা ভেবে তুমি মনে কষ্ট পে'ও না, এ আমার সয়ে যাবে।”

মুখে 'এ আমার সয়ে যাবে' বলিলেও কন্যা মনে কিরূপ আঘাত পাইতেছে ইহা বৃদ্ধ বুঝিতেছিলেন। ভালবাসা যে কোনো আইন-কানুন মানিতে চায় না—ইহা বৃদ্ধের না-জানা ছিল না এবং পিতার অমনোনীত হইলেও বা নাস্তিক হইলেও জীবনের প্রথম ভালোবাসার পাত্রকে যে ভোলা কত সুদুঃসহ, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতে না পারিতেছিলেন এমন নয়। তাই কন্যাকে আর অন্য কিছু না বলিয়া তখনকার মত বিদায় দিয়া বৃদ্ধ নিজের শাদা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে ভাবিতে লাগিলেন। অপবিত্র নাস্তিকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ না দেওয়া যে সর্ব্বদাই উচিত হইয়াছে এ বিষয়ে তিনি মোটেই সন্দিহান ছিলেন না—কিন্তু তিনি ভাবিতেছিলেন রমাকে এ আঘাত কতদূর লাগিবে—কতদূর তাহাকে মুহ্যমান করিতে পারিবে—সে নিজেও কি ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন এই লোকটাকে সংশয়হীন-চিত্তে বিবাহ করিতে পারিত? এই সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত অস্বস্তিতে বৃদ্ধের সেদিন কাটিল। একবার মনে হইতেছিল—কন্যাকে অবাধভাবে সকলের সঙ্গে মিশিতে দিয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন—না হইলে এ ব্যাপারটা তো ঘটিত না; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন তাঁহার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কন্যার এমন পাত্রে বিবাহ হইতে

পারিত যাহার সহিত মোটে বনিবনাও হইত না। কারণ দু'চার দিনের পরিচয়ে মানুষকে কি-ই বা চেনা যায়? এই বিজয়কে তো তিনি মাসাবধি কাল ধরিয়া দেখিতেছেন;—আর বস্তুত, এমন ছেলে সত্যই তিনি কম দেখিয়াছেন। কিন্তু আজ হঠাৎ কি একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আসিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল! এ সর্ব্বৈব ভবিতব্যতা! বরং এই-ই ভালো হইল। রমা নিজের বুঝিয়া পড়িয়া লইবার একটা অবসর পাইল,—এই ব্যাপারে তাহার আত্মোপলব্ধির সহায় বৈ অন্যথা হইবে না। রমা যদি সব ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার অনভিপ্রায় সত্ত্বেও বিজয়কে বিবাহ করিতে রাজী হয়—তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এ বিবাহে আর বাধা দিবেন কিনা। তিনি ঠিক করিয়া রাখিলেন, শীঘ্রই পরোক্ষভাবে রমার মতামত জানিয়া লইবেন।

১৪

বিজয় দেখিল চক্রধরপুরে থাকা তাহার অসহ্য;—এখানে থাকিয়া রমার দর্শন না পাওয়ার মত যন্ত্রণা সে বরদাস্ত করিতে পারিবে না। তাই পিসিমাও নিজের ম্যানেজারকে সে তার দিল—একজন যোগ্যলোক তাহারা যেন যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ীর খবরদারী করিতে পাঠাইয়া দেয়, নানা কারণে সে শীঘ্রই কলিকাতা যাইতে চায়। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি যোগ্যলোক পৌছান সম্ভব হইল না বলিয়া বাধ্য হইয়া আরো কয়েকদিন সে চক্রধরপুর ছাড়িতে পারিল না। ইতোমধ্যে একদিন বৈজু মারফত পত্রযোগে বিজয় রমার নিকট একবার শেষ সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিল।

রমা তাহা পাইয়াই একবার ভাবিল বাবা এ বিষয় জানিতে পারিলে হয়তো অসন্তুষ্ট হইবেন—কিন্তু তাহার ইহাও মনে পড়িল এই মানুষটি কি করিয়া দিন কাটাইতেছে। নিজের অবস্থা হইতে সে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এমন নয়। সে-ওতো একটিবার এই সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছে। যাহাকে সে তাহার কুমারী-জীবনের সমগ্র ভালোবাসা নিবেদন করিয়াছে—সে যদি যাইবার বেলা তাহাকে ভুল বুঝিয়া চলিয়া যায় সে কি তাহার সহ্য হইবে? সে তো তাহাকেই প্রিয়তম বলিয়া মনে মনে স্বীকার করিয়াছে—তা হৌক না সে নাস্তিক—তবু সে আসন কি টলাইবার?

কিন্তু এ হেন যে মানুষ, তাহার প্রতিও বিদায়কালে তার কি একটা কর্ত্তব্য নাই? অবশ্যই আছে, অতএব সে সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু তাহার সাক্ষাতে যদি মন টলিয়া যায়—যদি পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—না না তাহা কখন হইবার নহে—তাহা হইলে এতদিন সে বৃথাই মনুষ্যত্বের গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে, বৃথাই মাতা ও পিতা উভয়ের স্নেহ একমাত্র পিতার স্নেহধারার মধ্য দিয়া ভগবান মুক্তহস্তে তাহার উপর সিঞ্চন করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

সাক্ষাতের পর বিজয় কহিল—"এইবার আমাদের শেষ সাক্ষাৎ রমা?"

দেখা হইবার পর অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিতে পারে নাই—কেবল পরস্পর হস্তসম্বদ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেছিল। এবার রমা বিজয়ের হাতে একটু চাপ দিয়া কহিল, "শেষ সাক্ষাৎ কেন বিজয়, বেঁচে থাকলে বহুবার হয়তো দেখা হবে—তবে এভাবে সাক্ষাৎ হয়তো এই শেষ।"

"তার মানে?"

বিষাদের একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া রমা কহিল, "প্রণয়ী প্রণয়িনী হিসাবে

তো আমাদের এমনি নিভৃতে মেশা ভবিষ্যতে আর উচিত হবে না—আজ‌ই হয়তো তা' উচিত ছিল না—"

"কেন রমা ?"

"কেন তা কি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে বিজয় ? আমাদের উভয়ের জীবন যখন পাশাপাশি বেয়ে চল্‌তে পারবেই না তখন এভাবে ইন্ধন-সংযোগ ক'রে আগুনকে বাড়িয়ে তোলা বৈ তো কিছু নয়—তার ফল ভাল হবে না।"

"কেন ভাল হবে না—"

"তুমি হয় তো একথা শুনে হাস্‌বে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার আমার মিলনের ফল যদি ভালোই হবে তবে ভগবান্ আমাদের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতেন না।"

"আমি হাস্‌ব কেন রমা—আমার নিজের ভগবানে বিশ্বাস নেই ব'লে পরের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা ক'রব না কেন ?—কিন্তু আমি নাস্তিক ব'লে কি তোমার কাছেও অত ঘৃণ্য জীব ?"

"না।"

"না ?—সত্যি বলছ 'না'—? তবে—তবে রমা তুমি আমায় ত্যাগ করবে কেন ?"

"আমি তো তোমায় ত্যাগ করি নি। কিন্তু এ আমার বাবার ইচ্ছা—এর বিরুদ্ধে আমার সমস্ত ইচ্ছাকে পঙ্গু হ'য়ে যেতেই হবে।"

"তুমি তো বল্লে নাস্তিক ব'লে তুমি আমায় ঘৃণা কর না—কিন্তু তোমার বাবার ব্যবহার তুমি কি সমর্থন কর ?"

"বাবার কাজের উপর আমি কোনো মত প্রকাশ করতে পারব না—কিন্তু একথা ঠিক যে বাবা আমার প্রতি স্নেহাতিশয্যে এ বিবাহে যতটা

আশঙ্কা করেন আমি তা' করি না এবং আমার প্রতি স্নেহাতিশয্যই এ আশঙ্কার কারণ। সেই জন্যই তাঁর ইচ্ছার মূল্য আমার কাছে এত বেশী—তার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে এত শক্ত।"

বিজয় রমার হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে আঙুল মট্‌কাতে মট্‌কাতে বলিল' "কিন্তু আর একটা কথা—তুমি অনেকদিন বলেছো যে আমাদের উভয়ের মিলনে আমরা উভয়ে সার্থক হব। কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ আমাদের—অন্ততঃ আমার জীবন যে বিরাট ব্যর্থতায় ভরে' যাবে—তার জন্য দায়ী হবে কে? তোমার নিজের ভালোমন্দ জ্ঞানের কোনো মূল্য কি তুমি এখনো দিতে চাও না নাকি? যদি তা দাও তবে তুমি এ মনে কর নাকি যে তিনি তোমার পিতা ব'লে নির্ব্বিবাদে তিনি যা' বলেন তাই করতে হবে—তুমি তাঁর মেয়ে ব'লে কি তোমাকে নিয়ে তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন?"

পিতার উপর বিজয়ের এই ইঙ্গিতে রমা একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "আমার ব্যক্তিত্ব কিছুই নেই—এ বিশ্বাস আমার না থাক্‌লেও আমি নিজেই স্বাধীনভাবে ভেবে দেখেছি আমাদের মিলন হ'তে পারে না।"

বিমূঢ়ের মত কিয়ৎক্ষণ রমার দিকে চাহিয়া বিজয় প্রশ্ন করিল, "তবে কি আর তুমি আমায় ভালোবাসো না?"

এইবার উত্তরে রমা বিজয়ের হাত দুইখানি হাতের মুঠায় লইয়া বিজয়ের একান্ত নিকটে ঘেঁষিয়া বলিল—"তোমার কি মনে হয়?"

বিজয়ের আবার সব গোলমাল হইয়া গেল। সে একটু থামিয়া বলিল, "দেখ রমা, তুমি একদিন বলেছিলে বিয়ে না হ'য়ে গিয়ে থাকলেও তুমি মনে কর আমিই তোমার স্বামী—কথাটা কি ঠিক বলেছিলে?"

মৃদু হাসিয়া রমা কহিল, "মনে তো হয় ঠিকই বলেছিলাম—"

"তাহলে, তাহ'লে রমা—আমাকে যদি তুমি স্বামী ব'লেই মানো—তবে

আমার ইচ্ছাতেই কি তোমার ইচ্ছা নয়—আমার পথই কি তোমার পথ নয়?—তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রে তো তাই বলে।”

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া যেন রমা বুকের ভিতরটা খুঁজিয়া লইল—তারপর বলিল—“ছাখো, তোমার প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে, বাবার প্রতিও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু এখানে দুজনের প্রতি কর্ত্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে, এ স্থলে পিতার প্রতি কর্ত্তব্যটাকেই আমি বড় ব'লে বেছে নিয়েছি; কারণ জানি না—তবে কতকটা বোধ হয় এই যে বাবা সহায়সম্পদহীন অক্ষম বৃদ্ধ, তুমি সক্ষম যুবাপুরুষ—বেদনা অনেক বেশী সইতে পারবে। আমার অস্তিত্বের প্রতি অনুপরমাণু বাবার স্নেহের কাছে ঋণী—সেই পাঁচ বছর বয়সে মা মরার পর থেকে তুমি তো জানোই আমি তাঁর জন্য মায়ের অভাব বোধ করতে পারি নি; আর যৌবনের ভালোবাসার জন্য ঋণী আমি তোমার কাছে;—এই দুই ঋণের মধ্যে প্রথমটাই আমার বড় মনে হোলো। কিন্তু কেন মনে হ'ল তা' নিয়ে বিচার করতে অক্ষম—মনে হ'ল এই পর্য্যন্তই মেনে নাও—আর আমি জানি তুমি সন্তুষ্টচিত্তে তাই মেনে নেবেও। তুমি নিজেকে নিজে বারবর দুষে এসেছো, কিন্তু আমি জানি তুমি কত বড় মহান্‌। সেদিন সকালে বাবার কঠিন ব্যবহারে তুমি যে সংযমের পরিচয় দিয়েছে তা' তোমারই উপযুক্ত—” বলিয়া অশ্রুসজলচক্ষে বিজয়ের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল—পরে হাতের মুঠিতে ধরা বিজয়ের হাত দিয়া নিজের চক্ষের কোণ মুছিয়া পুনরায় বলিল, “তুমি হয়তো আমার ব্যবহারে আজ আমায় নিষ্ঠুর ভাব্‌ছ, ভাবছ যে আমি কত বড় হৃদয়হীনা যে আজকের দিনেও তোমার সঙ্গে কত কথা কাটাকাটি করলাম, কত যুক্তির জাল সৃষ্টি করলাম—যা' হয়তো তোমার মনে মোটেও ভালো লাগে নি। কিন্তু আমায় ভুল বুঝো না। বাবাকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার থাকলে তার চেষ্টা আমি

করতাম, কিন্তু তাঁর চক্ষে তোমার যে অপরাধ তা অমার্জ্জনীয়—আমার কথা কইতে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে।” রমা চুপ করিল।

রমার শেষ কথাগুলি শুনিতে শুনিতে বিজয়ের দুই গাল বহিয়া শেষ মুহূর্ত্তে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে খানিকক্ষণ পরে কহিল, “তোমার স্বামী হবার সৌভাগ্য আমার হবে না তা' আমি জান্‌তাম, আমি কোনো দিন নিজের মনে আশ্বাস পাই নি যে তোমায় পাব—কিন্তু তোমার বন্ধু হবার ভাগ্যটুকুও যেন আমাকে না হারাতে হয়—”

“বিজয়, তুমি জানো যে তুমি আমার বন্ধুর চাইতে অনেক কিছু বেশী—একথা বলবার তো কোনো আবশ্যক ছিল না।”

“আর একটা কথা—আমায় চিঠি দেবে কি? তোমায় আমি চিঠি লিখ্‌বার অনুমতি পাবো কি?”

“তুমি আমায় চিঠি দিও না, বাবা তা পছন্দ করবেন না। আমার প্রয়োজন হ'লে তোমায় চিঠি দেবো। তোমার ঠিকানাটা আমায় দাও।”

বিজয় তাহার কলিকাতার ঠিকানা বলিলে রমা কহিল, “তাহলে বিজয়, এবার বিদায়—তুমি পুরুষমানুষ; দুনিয়ার হাজার কাজের মাঝে জীবনের এ অধ্যায়টাকে যতটা ভুলে থাক্‌তে পারো চেষ্টা কোরো; কিন্তু—” একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—“একেবারে ভুলে যেয়ো না।”

রমার হাত দুইখানিতে নিজের চোখ মুখ ঢাকিয়া বিজয় বলিল, “যাবার বেলা এসব মৃত্যুবাণগুলা না মার্‌লেও তো পারো রমা—” একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিয়া “কিন্তু আর একটা কথা —”

“কি?”

“তোমার স্মৃতিচিহ্ন যদি কিছু আমায় দিয়ে যেতে—তাহ'লে সেটাও, সেটাও মাঝে মাঝে আমার সান্ত্বনার একটা স্থল হেতো—”

রমা উত্তরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "না বিজয়, সান্ত্বনা তাতে হবে না, অষ্টপ্রহর জ্বালা বাড়বে ও-সবে কাজ নেই। একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের স্মৃতি বুকে ধরে' কি ছিঁচ-কাঁদুনি কেঁদে বেড়াবে—যদিও" মৃদু হাসিয়া—"সত্যি বল্‌তে কি—একথা মনে করতে আনন্দ আছে যে কেউ আমার জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে।—যাক্ এবার তাহলে আসি, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।"

"তুমি সত্যই পাষাণী রমা—"

হাঁটু গাড়িয়া আজ প্রথমবার বিজয়ের চরণধূলি মাথায় লইয়া রমা বলিল, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন—" এবং আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

বিজয়ের মুখে কথা জোগাইল না। গলার মধ্যে তাহার কি যেন একটা বাধা ঠেলিয়া উপর দিকে উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতেছিল। রমার প্রণামে সে বাধা দিতেও পারিল না। স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল—রমা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ সপ্তাহেক পর্য্যন্ত কন্যার গতিবিধি স-মনোযোগে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে যতটা বিমর্ষ সে হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই সে হয় নাই। তিনি নির্জ্জনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন রমা বেশ সাম্‌লাইয়া লইযাছে। সে পূর্ব্বের মতোই হুড়হাঙাম করিয়া রান্নাবান্না করিত—বাপের সঙ্গে দিনের মধ্যে পাঁচবার আব্‌দারের কোন্দল বাঁধাইত, সময়ে অসময়ে বেহালা এস্রাজ লইয়া কসরতও চলিল, পড়াশুনাও আবার সুরু হইল—দুই স্কুলেরই কাজ কর্ম্ম তো একদিনও কামাই যাইতে পারে নাই। ইতোমধ্যে বিজয়ের পয়সায়—প্রকাশ্যে বিজয়ের পিসিমার পয়সায়—(তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না) ফ্রী স্কুলে মাষ্টারও ইদানীং রাখা হইয়াছিল—বিজয় ছয় টাকা সুদে মাষ্টারের মাইনার জন্য দুই হাজার টাকা ব্যাঙ্কে তাহার পিসিমার নামে জমা দিয়াছিল।

সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ডালে নুন দেওয়া লইয়া রমার কি বচসা হইতেছিল, এমন সময় বৃদ্ধ ডাকিলেন "রমা-মা"—

"আস্‌ছি বাবা—" বলিয়া মিনিট দুই পরে রমা পিতার কাছে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিল।

টেবিলের উপরে শাদা এক টুকরা কাগজের উপর একটা লাল-নীল পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিতে কাটিতে বৃদ্ধ আরম্ভ করিলেন, "সেদিন থেকে আমি ভাবছি যে বিজয়কে চরম কথা দেবার আগে তোমার মতামত একবারও জিজ্ঞাসা করিনি মা। তোমার কি মনে হয় ব্যাপারটা অন্য রকম ঘটাই উচিত ছিল? মানে—"

পিতার কথায় বাধা দিয়া রমা কহিল—"আবার কেন বাবা সে

কথা? যা হবার তা তো হ'য়েই গিয়েছে, আবার সে সব কথা খুঁচিয়ে তুল্‌ছ কেন?"—

"না না, খুঁচিয়ে তুলছি না—আমার কাজটাকে, তোমারই সম্বন্ধে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজটাকে—কি ভাবে তুমি নিলে তা কি আমার মনে প্রশ্ন হওয়াটা অস্বাভাবিক?"

"তুমি দেখছি আমায় ও-কথা ভুলতে দেবে না। আমি তোমার চিরকাল "রমা-মা" থেকে কি কিছু বদ্‌লেছি লক্ষ্য করছ বাবা?—তবে আবার ও কথা জিজ্ঞাসা করছ্‌ কেন?"

"কিছুমাত্র বদ্‌লাও নি ব'লেই আমার আরো মনে হচ্ছে, তুমি তোমার বুড় ছেলেকে তুষ্ট করবার জন্য বুঝি-বা মনের সঙ্গে কতকটা জুলুম চালাচ্ছ। সত্যি মা, এ বিয়েতে তোমার নিজের কোন আপত্তি ছিল কি?"

"তোমার যখন আপত্তি ছিল তখন আমারও বিলক্ষণ আপত্তি ছিল বৈ কি?"

উত্তরে বৃদ্ধ কিছুক্ষণ ধরিয়া সামনের রেখাঙ্কিত কাগজখানি পরীক্ষা করিলেন। তারপর হঠাৎ আসন ছাড়িয়া জানালার কাছে গিয়া বাহিরের পানে মিনিট দুই চাহিয়া থাকিয়া, রমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "তোর বুড়ো ছেলেকে ভাঁড়াস নে মা—একথার মানে কি স্পষ্ট ক'রে আমায় বল্‌। আমি যা' জান্‌তে চাচ্ছি তা তুই নিশ্চয় বুঝছিস্‌, আমায় সোজা উত্তর দে। বাপ-মা হওয়া যে কি ঝকমারী রমা, তা তো জানিস নি—" বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল।

রমা তাড়াতাড়ি বাপের চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বাঁ হাতখানি নিজের বগলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"আর ছেলেমেয়ে হওয়াটা যে কি ব্যাপার বাবা, তা তোমার এতকাল হ'য়ে গিয়েছে যে নিশ্চয় তুমি

ভুলেই গিয়েছো, নইলে তুমি এমন ক'রে খাম্‌কা খাম্‌কা গম্ভীর হ'যে যেতে না। তোমার এ সোজা কথাটা জিজ্ঞাসা করবার রকম দেখে আর বাঁচিনে—"

বৃদ্ধের মুখ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তবে বল্।"

রমা কহিল, "নাস্তিক ব'লে বিজয়বাবুকে বিয়ে করতে ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কোন আপত্তি ছিল না—কেননা আমার মনে হ'ত—যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব এত সহজে বিশ্বাস-যোগ্য যে তাতে তিনি বেশী দিন অবিশ্বাস করতে পারতেন না—আমিও হয়ত' সে বিশ্বাস আন্‌তে কিছু সাহায্য করতে পারতাম।—কিন্তু তুমি যখন মানা করলে বাবা, আমার মনে হ'ল ঈশ্বরের এ বিয়ে অভিপ্রেত নয়। তুমি আমার চাইতে অনেক বেশী বোঝ, অর্থাৎ এ বোকা মায়ের জন্য তোমার প্রাণটাকে যে তুমি হাতের মুঠোয় ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার—আমার ভালো ছাড়া জীবনে যে তোমার অন্য কাম্য নাই, সে সব কি আমি জানিনে বাবা? তাই তোমার ইচ্ছার ভেতর দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাই আমার কাছে এসে পৌঁছেচে, তাই আমি মনে করি।"

বৃদ্ধ বিস্ময়মিশ্রিত পুলকে কিয়ৎকাল কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন—"আচ্ছা, কি কাজ কচ্ছিলে করগে।"

রমা চলিয়া গেলে তিনি ধীরে ধীরে চেয়ারে উপবেশন করিলেন—কিন্তু স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না। চেয়ারের মধ্যে কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া উঠিয়া মেঝেতে পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—হাত বক্ষসম্বদ্ধ, নয়নে চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি, দেহ ঈষৎ অবনমিত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম জমিয়াছে, শিরাগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুগৌরব মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশ তাঁহার চরণক্ষেপ যেন ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল। পদচারণ করিতে করিতে তিনি অস্ফুটে কি বলিয়া উঠিতেছিলেন; মধ্যে

মধ্যে তাহার দুই-একটা কথা ধরা যাইতেছিল। 'তাইত; ওর কোন আপত্তি ছিল না'—'রমার সাহায্য'—'কতদূর ফল হোতো?'—'প্রাণ দিতে পারে'—'তা পারে বৈকি?'—'কিন্তু রমার সুখ'—'অপবিত্র নাস্তিক'—এমনই সব কথার টুকরা তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্যের নিদর্শন লইয়া ওষ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল।

এম্‌নি প্রায় আধঘণ্টা পাইচারি করিয়া তিনি হঠাৎ একবার ডাকিলেন—"রমা—"

রমা আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই জানিস্‌ বিজয় এখানে আছে কিনা—না চলে' গিয়েছে?"

"ঠিক জানি নে। হয়তো গিয়েছেন। পরশুর আগের দিন যাবেন এম্‌নি কথা ছিল, অন্ততঃ আমায় তাই বলেছিলেন—"

"কখন বল্লে?"

রমা একটু ফাঁপরে পড়িল। সত্য বলিলে বিজয়ের প্রস্থানের পূর্ব্বদিনে তাহার সহিত সাক্ষাতের কথা খুলিয়া বলিতে হয়। সে চট্‌ করিয়া বলিল, "তিনি যে দিন যাবেন ব'লে কথা ছিল, তার আগের দিন মাঠে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"—অংশতঃ কথা চাপা দিয়া এইরূপ কথা বলা তাহার ইদানিং রপ্ত হইয়াছিল। কথাটা মিথ্যাও হইল না বটে—মাঠে বেড়াইতে তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল! প্রেম-গোপনাতার এই মধুর প্রক্ষেপটুকু তরুণ তরুণীকে শিক্ষা দেয়, ইহাকে শঠতা বলা চলে না।

বৃদ্ধ এ বিষয়ে আর প্রশ্ন না করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা মা, বৈজুক একবার পাঠিয়ে দিগে তো আমার কাছে—"

রমা চলিয়া যাইতেছিল, দরজার আড়াল হইতেই পিতা আবার ডাকিলেন, "মা—আর একটা কথা—"

"কি বাবা—"

"এই ভাবছিলুম কি—যে অপরেশকে যতীশের সম্বন্ধে কি লেখা যায় ?"

রমা মুখ তুলিয়া স্পষ্ট উত্তর দিল, "তার আর ভাববে কি বাবা—লিখে দাও এ বিয়ে হ'তে পারে না।"

বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—"আমি তো এতক্ষণ ধ'রে ঠিক এর উল্টো কথাটি ভাবছিলাম মা !—তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে সেদিনকার ব্যাপারটাতে যদি এমন কোন গুরুতর ভাবান্তর তোমার না হ'য়ে থাকে তবে যতীশকে আস্‌তেই বরং লিখি দি ?"

রমা দৃঢ়স্বরে জবাব দিল "আস্‌তে একবার ছেড়ে তুমি দশবার লিখে দাও, কিন্তু কোন বৃথা আশা দিয়ে তাঁকে এনো না—"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "যদি আনিই—যদি তোমায় বলি যে এটা আমার ইচ্ছা।"

পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে রমা জবাব দিল, "তাহলে বাবা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমায় বলতে হচ্ছে যে জীবনে এই প্রথমবার তোমার কথা আমি রাখতে পারব না। তোমার কথায় আমি স-ব করতে পারি বাবা, শুধু বিবাহ ছাড়া —কারণ আমার মনে হয় বিবাহ করবার আমার আর অধিকারই নাই।"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তবে কি তুমি চিরকাল কুমারী থাকবে নাকি ?"

"অগত্যা হয়তো তাই থাকতে হবে। কিন্তু বাবা আমি বুঝতে পারি না এ নিয়ে তোমার এত ভাবনা কেন ? আমাকে যে ক'টা দিন পারো—কাছে কাছে রেখে সুখ ক'রে নাও।"—তারপর একটু তরল হাস্যের সঙ্গে কহিল, "দাঁত থাকতে তো লোকে দাঁতের মর্ম্ম বোঝেনা—স্বর্গে যাবার বেলা আমায় যখন রেখে যেতে হবে, তখন বুঝ্‌বো যে আমাকে ছেড়ে যাওয়াটা কি মজা ! —সত্যি বাবা, আমায় যদি তোমার কাছছাড়া করতে চাও আমি কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা কর'ব। তোমায় ছেড়ে আমার

কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না। তা' ছাড়া আমার বিয়ে দিলে সে অন্যায়ের ভাগী তোমাকেও হ'তে হবে, তা' আমি কিছুতে হতে দিতে পারব না। তুমি আমার চাইতে যদিও সবই বেশী ভাল বোঝ তবু—এ বিশেষ বিষয়টাতে অন্যায় কতখানি হবে তার বিচারে আমার কথারই মূল্য বেশী—একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।"

বৃদ্ধ কন্যাকে বিদায় দিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার কল্পনাই তবে ঠিক—তাঁহারই জন্য এ বালিকা অম্লানবদনে তাঁহার দেওয়া দুঃখ মাথায় বহিয়া লইয়াছে—কন্যা কতখানি ভালোবাসিয়াছে এখন তো তাহা তাঁহার কাছে আর অজ্ঞাত রহিলনা। আর বিজয় তো সত্যই তাহার অনুপযুক্ত নয়—সে নাস্তিক ; কিন্তু নাস্তিক বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার তাঁহার আছে কি ?—অথচ সত্য বলিতে গেলে ঘৃণাতেই তিনি তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু ঘৃণা না করিলেও, ঘৃণা না-করা আর তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া অনেক তফাৎ জিনিস।—না না, ঈশ্বর যা করিয়াছেন মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন।—কিন্তু রমার ভবিষ্যৎ কি হইবে ? এই তেজস্বিনী আদরিণী কন্যা তাহার কি চিরকাল ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া কৃচ্ছ সাধন করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে—আবার তাঁহার বুক ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পুনরায় তিনি অসংস্থিতচিত্ত হইয়া ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিলেন।

রমার অনুজ্ঞানুযায়ি প্রভুর আদেশ তামিল করিতে বৈজু আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ তাহার পানে চাহিয়াও কোনো কথা কহিলেন না দেখিয়া মিনিট পাঁচেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে সসঙ্কোচে সে প্রশ্ন করিল, "বাবুজী কেঁও বোলায় হেঁ ?" প্রথমবার কথা বৃদ্ধের কর্ণ-গোচর হইল না, দ্বিতীয়বার গলা একটু চড়াইয়া প্রশ্ন করিতেই তিনি হঠাৎ

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিলেন, "অ্যাঁ, বৈজু—তোমাকে—না দরকার নেই—যাও।"

বৈজু বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল।

১৬

কলিকাতা যাইয়া নানা হুড়হাঙ্গামের মধ্যে নিজেকে অনেকটা ব্যাপৃত রাখার ফলে মনের গুরুভার অনেকটা পাৎলা হইবে এ আশা বিজয় করিয়াছিল। কার্য্যে দেখিল সে জ্বালা নিভান দূরস্থান, ছাইচাপা দেওয়াও বড় সোজা নয়। নানা কাজে সে অন্তরের জগৎটাকে ভুলিয়া থাকিতে চায় বটে কিন্তু একটুখানি ফুরসুৎ পাইলেই সেই চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া বুক জুড়িয়া বসে। তারপর কর্ম্মশেষে দিনান্তে সে যখন গৃহে ফিরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত, মনের মধ্যে তখন তুমুল ঝড় সুরু হইত। শয়নে স্বপ্নেও সেই এক দৌরাত্ম্য। সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মদ সে সম্পূর্ণ ছাড়িয়াছিল আবার মদ ধরিল—যদি ভুলিয়া থাকিতে পারে। পারিতও—কিন্তু নেশা ভাঙিলে যে জ্বলুনি সুরু হইত, তাহা যেন তাহাকে জীবন্তে তুষের আগুনের মত দগ্ধাইয়া মারিত। তাহার ফলে দেখিল নিজেকে তখন টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয় এই মনে করিয়া যে মাতাল আমি—আমার সে চিন্তা করিবারও অধিকার নাই। মত্তাবস্থায় রমার ভাবনা ভাবিয়া তাহাকে যেন সে অপমান করিতেছে। সপ্তাহান্তে আবার সে মদ ছাড়িল, যেন তাহার মুখখানি ভাবিতেও নিজেকে অনধিকারী মনে না হয়। আর একবার ভাবিল কাজে চিত্তকে পূর্ণবিক্ষিপ্ত করিতে না পারিলে সে এবার আমোদ প্রমোদে গা' ঢালিয়া দিবে; আবার সুরু হইল পার্টি, ক্লাব, ডিনার, মিষ্টার, মিসেস্ ও মিস্ রায় বসু ঘোষ, বোস, মিত্রদের আড্ডা,

বায়স্কোপ থিয়েটার। কিন্তু সমস্তই এমন ফাঁকা মনে হয় যে চিত্তকে সে-সব কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। ক্লাবে খেলার পর খেলা চলিতে থাকে, ডিনার পার্টিতে কলকোলাহলের মধ্যে আশে-পাশে বন্ধুদের প্লেটের পর প্লেট উঠিয়া যায়, আড্ডায় গান গল্পে হাসির হর্‌রা সর্‌গরমে ছুটিয়া চলে, বায়োস্কোপ থিয়েটারে দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হইয়া যায়—কিন্তু এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাহার মন যে কোন্ সময় চক্রধরপুরের কোন্ বৈকালিক মাঠে, পল্লীপ্রান্তের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ভাঙা ঘরে ও পাড়ায় পাড়ায় রুগ্ন-আতুরের শয্যা পার্শ্বে—একটী কিশোরীর সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার সে হদিস্ করিতে পারিত না ;—সে সময় তো কাটিত বেশ, কিন্তু চকিতে এই স্বপ্নের রাজ্য ভাঙিয়া বাস্তব রাজ্যে যখন সে চলিয়া আসিত তখন হতাশায় বুকের মধ্যে যে কি প্রচণ্ড বেদনা গুমরাইয়া উঠিত তাহা শুধু সেই জানে। চক্রধরপুর ছাড়িয়া আবার মাসেক পর একদিন বিজয় সন্ধ্যাবেলা বায়োস্কোপ হইতে ফিরিয়া ইজি-চেয়ারটায় দেহ এলাইয়া পড়িয়া ছিল, এমন সময় বাড়ীর দুয়ারে একখানি টেক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে ভদ্রমহিলার বেশধারিণী এক রমণী অবতরণ করিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজী মোকানমে হয়ে ?" এবং গৃহস্বামী বাড়ীতে আছেন জানিয়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া দারোয়ানকে বলিল, "বাবুজীকো মেরা সেলাম দেনা"। দারোয়ান বলিল, তিনি ড্রয়িং-রুমে বসিলে সে খবর ভেজিবে এবং রমণী তাহার সহিত অগ্রসর হইয়া ড্রয়িং-রুমে যাইতেই উভয়েরই চোখে পড়িল, বিজয় বাড়ীর মধ্যে নহে ড্রয়িং-রুমেই দরোজার দিকে পিঠ করিয়া একাকী একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া ধীরে ধীরে একটা চুরুট টানিতেছে। রমণীর জুতার শব্দ শুনিয়া চোখ ফিরাইয়া বিস্ময় চকিত দৃষ্টিতে ও অপ্রসন্নস্বরে বিজয় বলিয়া উঠিল, "তুমি এখানে—এ সময়ে ?—"

দারোয়ান সেলাম করিয়া বিদায় লইলে রমণী মৃদু হাসিয়া একখানা পাৎলা চেয়ার নিজেই বিজয়ের সম্মুখে টানিয়া লইয়া বসিল। বিজয় অনাহূতভাবে হঠাৎ এসময় এ-বেশে মিস্ তরুবালাকে তাহার বাসাবাড়ীতে আসিতে দেখিয়া এতটা অবাক হইয়া গিয়াছিল যে তাহাকে বসিতে পর্য্যন্ত বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বিজয় চক্রধরপুর হইতে সেই দুই শত টাকা তাহাকে ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইবার পর হইতে আর তরুবালার কোনো খোঁজ-খবর লয় নাই, লইতে ইচ্ছাও হয় নাই। এই যে মাসখানেক হইল চক্রধরপুর ছাড়িবার পর সে কলিকাতা আসিয়াছে ইহার মধ্যে সে একবারও তাহার নিকট যায় নাই বা খবর লয় নাই। তিন চার দিন বাসন্তী থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গিয়াও তাহার সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। দুই দিন বক্স হইতে তাহার সহিত চোখা-চোখি হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিজয় চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে।

বিজয় ভাবিয়াছিল এইরূপেই ইহার সহিত সম্বন্ধ চুকাইয়া ফেলিবে। ইহারা তো আদর-আপ্যায়ন ও অর্থের দাসী মাত্র—তাহার অভাব হইলেই ইহারা আপনিই খসিয়া পড়িবে এবং খসিয়া পড়িলেই মঙ্গল। ইহাদের সংসর্গ ভালো লাগিবার দিন তাহার চলিয়া গিয়াছে।

বিজয় ইচ্ছা করিয়াই মাস দুই হইতে তাহার তত্ত্ব লয় নাই বটে কিন্তু তরুবালা লইয়াছিল। দিন কয়েকের মধ্যে ফিরিব বলিয়া যখন বিজয় দশ পনেরো বিশ দিনেও ফিরিল না তখন সে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইয়াছিল সে কেন ফিরিতেছে না; কিন্তু প্রেরিত লোক বিজয়ের বাসা হইতে সঠিক সংবাদ আনিতে পারে নাই। এদিকে বিজয় পত্র লিখিতেও বারণ করিয়া গিয়াছে—তাহার উপর তাহার পিসিমার বাড়ীতে গিয়াছে—এ অবস্থায় এ বিষয়ে অবাধ্য হইতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। ইতিমধ্যে সখ করিয়া বিদেশে বিজয়কে পাঠাইবার জন্যই সে ফোটো তুলিয়া তাহাকে

পাঠাইয়াছিল। আশা করিয়াছিল উত্তরে নিশ্চয় বিজয়ের একখানা চিঠি সে পাইবে—তাহার বাড়ীতে কোনো পিসিমা খবরদারী করিবার জন্য বসিয়া নাই। কিন্তু তাহাও আসিল না। সে চিন্তিত হইতে লাগিল। বিজয়কে যে শুধু তাহার অর্থের প্রয়োজনীয়তার জন্যই দরকার, তাহা নহে—সে বিজয়কে তাহার নিজের মত ভালোও বাসিত। অর্থের প্রয়োজনীয়তা তাহার খুব বেশী নহে। একা মানুষ—সে দুশো টাকা মাহিনা পাইত—একজন কর্ম্মঠ বুদ্ধিমতী ঝি রাখিয়াছিল, তাহাতেই তাহার বেশ চলিয়া যাইত। বেশী লোকজন তাহার কাছে পাত পাড়িতে পারিত না, বাছা বাছা লোক লইয়া নিজ গৃহে বা বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছাড়া সে গান বাজনা করিত না। তাহার মা ছিল কীর্ত্তনওয়ালী। পয়সার তাহার অভাব ছিল না, কাজেই কন্যাকে যথাসাধ্য লেখাপড়া ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা দিয়াছিল। তাহার মায়ের আযৌবন যে প্রণয়ীটি ছিল—সেটী নাকি তাহারই অন্নবস্ত্রে দেহরক্ষা করিত এবং তরুবালার মায়ের প্রৌঢ় জীবনের সূচনায় সে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়ায় তাহাকে এক মহাদুর্যোগের রাত্রে নিজের দেওয়া শেষ বস্ত্রখণ্ডও কাড়িয়া লইয়া তরুর মাতা সম্মার্জ্জনীর আঘাতে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং শোনা যায় সেই রাত্রেই নাকি হতভাগ্য লোকটা মারা পড়ে। তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমিকা কীর্ত্তনওয়ালীর চোখে এক-ফোঁটা জল কেহ দেখে নাই এবং তদবধি সে অন্য পুরুষের সংসর্গেও যায় নাই। এ হেন মায়ের মেয়ে তরুবালা মায়ের কঠোরতায় কতখানি উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিল ঠিক বলা হয়ত শক্ত, কিন্তু মায়ের যৌবনের রূপ চক্রবৃদ্ধি সুদে দশগুণ বাড়িয়া তাহাতে অর্শিয়াছিল। এত রূপ যে এ বালিকা কোথায় পাইল তাহা তাহাদের পাড়ায় একটা জল্পনার-বিষয় ছিল। কাজেই সুকণ্ঠ ও অল্প বিস্তর লেখাপড়ার ঐশ্বর্য্য লইয়া যখন সে যৌবনে পা দিল রঙ্গমঞ্চে প্রতিপত্তি হইতে তাহরে বিলম্ব হইল না। এমন

সময় জনৈক বন্ধুর কৃপায় বিজয় তাহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়। বিজয় তাহাকে যৌবনের খেয়াল তৃপ্তির একটা উপকরণ স্বরূপে পাইয়া ক্রমশঃ বেশ মাতিয়া উঠিল—নিজের বাড়ীতে আড্ডা দিত, তাহার বাড়ীতে আড্ডা দিত, যখন তখন বখ্‌শিস দিত, তাহার বিলোল কটাক্ষের উত্তরে নির্জ্জনে কখন কখন বা হাত মুখে তুলিয়া চুমাও দিত। কিন্তু তাহাতে তরুর আশ মিটিত না, তাহার ইচ্ছা হইত বিজয়কে আরো নিবিড় করিয়া পায়। সে সুযোগ বিজয় একদিনও দেয় নাই; কিন্তু সে ধৈর্য্য ধরিয়াছিল একদিন তাহার সে সুদিন আসিবে। সে জানিত বড়লোক সহজে ধরা দেয় না, সে জানিত কত সমাজে কত সুন্দরী নারী তাহার কৃপাকণা পাইবার জন্য লালায়িত, সুতরাং এত অধীর হইলে চলিবে কেন? কেন সে জয়ী হইবে না? তাহার এই লীলায়িত বাহু, গোলাপ পাপড়ীর মত ঠোঁট, পিট ছাওয়া কোঁকড়ান চুলের রাশ, দুধ-আলতার রং, ধনুর মত বাঁকা ভ্রূ, কালো জামের মত ডাগর চোখে বিদ্যুতের মতন চাউনি একি এতই তুচ্ছ করিবার জিনিস?—সে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, জয় তাহার সুনিশ্চিত।

এ হেন তরুবালা দিনের পর দিন খবর লইত কেন দুইদিনেই ফিরিব বলিয়া ক্রমে বিজয় পঁচিশ ত্রিশ দিনেও ফিরিল না। পরে হঠাৎ একদিন খবর পাইল বিজয় মধ্যে কলিকাতা আসিয়া তিন দিন মাত্র থাকিয়া আবার চক্রধরপুর চলিয়া গিয়াছে। এইবার তাহার রাগ হইল—কেন সে কি করিয়াছে—সে কি এতই অবহেলার পাত্র? বুকে মুখে চোখে যে তৃষ্ণা লইয়া সে চাহিয়া আছে, বিজয় কি এখনও তাহা বুঝিল না, সেকি তাহার নিকট একবিন্দু জলও প্রত্যাশা করিতে পারে না? চিন্তায় চিন্তায় অস্থিরতা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে সে ভাবিতে লাগিল বিজয় তো তেমন মানুষ নহে যে বুড়ী

পিসিকে আগ্‌লাইয়া নির্ব্বিবাদে সে এতদিন কলিকাতা ছাড়িয়া কাটাইয়া দিবে? তবে কিসের সেখানে আকর্ষণ? কিসের আকর্ষণে সেই পাহাড়ে পোড়ো জায়গায় সে বন্ধু-বান্ধব আমোদ আহ্লাদ ভুলিয়া—তাহাকে ভুলিয়া—একমাসের উপর কাটাইয়া দিল—আবার কলিকাতায় আসিল তো দুইদিনও তাহার তর সহিল না? তবে—তবে কি সেখানে—তাহার প্রেম-পিপাসী চিত্ত কল্পনায় সেখানে একটি ঈর্ষার পাত্রীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কি জানি সেখানে যদি কোনো সুন্দরী প্রেমের ডোরে তাহাকে বাঁধিয়া থাকে? তাহার এ সর্ব্বনাশ কি সে চুপ করিয়া সহ্য করিবে? না—সে আজই সংবাদ লইতে পাঠাইবে। ঝি গোলাপকে ডাকিয়া উপযুক্ত মন্ত্রণা দিয়া সেই-দিনই তাহাকে চক্রধরপুর পাঠাইয়া দিল। দিন চার পাঁচ পরে গোলাপ আসিয়া বলিল, সেই আশঙ্কাই বোধ হয় সত্য। সুচতুরা ঝি রমা সেনগুপ্তের খবর পাইয়া আসিয়াছিল—লুকাইয়া একত্র বেড়াইতে দেখিয়াছে, দূর হইতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের আভাসও পাইয়াছে। সে ফিরিয়া বলিল, "এইবার নিশ্চয় পোষ-না-মানা পাখী শেকলে বাঁধা পড়েছে, এ শেকল কাট্‌তে পারবে বলে মনে হয় না দিদিমণি, সে বড় শক্ত ঠাঁই।"

তরুবালা ব্যগ্র আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন রে?"

"সে বড় যে-সে মেয়ে নয়, দিদিমণি। সেখানকার সব লোকে তাঁকে প্রায় মা-জননী ভগবতীর মতো ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। বিজয়বাবু তেনার সঙ্গে খেলা করতে গেলে সে আগুনে নিজেই পুড়ে' মরবেন—তার ছায়াও মাড়াতে পারবেন না।"

শুনিয়া তরুবালার চক্ষু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল।

একই দিনে গোলাপ-ঝি আর বিজয় কলিকাতা ফেরে। চক্রধরপুর ষ্টেশনে নাকি বিজয় তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। সে তাহাকে সেখানে

আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গোলাপ যা'-তা' উত্তর দিয়া অব্যাহতি পাইল।

. তার পর পনের দিন চলিয়া গেল। বিজয় চক্রধরপুর ফেরে নাই। তরুবালা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। গোলাপটা যেমন বোকা—বিজয়ের মত পাখী আবার কোথাও বাঁধা পড়িবে! সে ভ্রূ বাঁকাইয়া হাসিয়া একদিন গোলাপকে বলিল—"কি রে গোলাপ, তোর মা-জননী ভাগবতীর খবর কি? ভগবতী ঠাকরুণ কি আমার চাইতেও স্থন্দর ছিলেন যে ক'লকাতা ছেড়ে নাগর আমার সে পাহাড় দেশের মেয়ের পায় বাঁধা পড়বেন?"

ঝির বিশ্বাস হইতেছিল না যে সে মেয়েটীর উপর বিজয়ের টান সত্যই এত সহজে ছিন্ন হইয়াছে।—আর টান যে হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসন্দেহ, না হইলে সে বৃথাই যৌবন ভরিয়া প্রেমের হাটের বিকি-কিনি করিল। সে অল্পে ছাড়ে নাই। বিজয়দের বাড়ীর ভৃত্যদের কাছে কোন সংবাদ না পাইলেও বৈজু ও রমাদের বাসার ঠাকুরের কাছে খবর লইয়া রীতিমত ডিটেক্‌টিভি করিয়া সে তাহাদের পাছু লইয়াছিল—কোনো দিন অলক্ষ্যে, কোনো দিন ছদ্মবেশে। তাহার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া কি সহজ? কিন্তু তখন কোনো উচ্চবাচ্য না করিয়া সে মনিবের মন জোগাইয়া উত্তর দিল—"আর যাই হোক—রূপে তোমার কাছে দাঁড়াতে পারে এমন লাখে কটা মেলে দিদিমণি?"

কিন্তু আরও পনেরো ষোল দিন গেল। বিজয় যদিও কলিকাতা ছাড়িয়া নড়িল না তবু সে তাহার সংবাদমাত্রও লইল না তো?—তুইদিন থিয়েটারে দেখা হইল—তবুও না! তাই সে আবার অস্থির হইয়া পড়িল এবং সেদিন সোমবার, কোনো অভিনয় ছিল না বলিয়া সে সাজসজ্জা করিয়া একা একখানা ট্যাক্সি লইয়া বিজয়ের বাসায় যাইয়া হাজির হইল।

বিজয় যেন অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল "তুমি—এখানে—এসময়ে ?—" তরুবালা একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল—"দেখো মূর্চ্ছা যেও না, আমি ভূতটুত নই, জলজ্যান্ত মানুষটাই আছি। আর এখানে তা তো দেখ্‌ছই—আর সময়টা এমন বিশেষ অ-সময়টাইবা কি যে আশ্চর্য্য হ'তে হবে ?—সাড়ে আটটার বেশী বোধ হয় বাজে নি!"

তাহার কথা কহিবার ধরণে একটু বিরক্ত হইয়া বিজয় জবাব দিল, "সাড়ে আটটা ?—ন'টা বেজে গেল। কিন্তু তুমি কেন এসেছ শুনি ?"

বিশ্বের সমস্ত বেদনার ছাপ মুখের উপর টানিয়া আনিয়া অভিনেত্রী কহিল, "বিরক্ত হয়েছ, উঠি তাহলে—" বলিয়া সত্যই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি কহিল, "না বিরক্ত কেন হব ? বেসো না। কিন্তু হঠাৎ এম্‌নি এসে হাজির তো তুমি কোনো দিন হও না!"

"দায়ে ঠেক্‌লেই আস্‌তে হয়!"

"মানে—টাকা চাই ?—" তাহাকে বাধা দিয়া তরুবালা কহিয়া উঠিল, "তুমি বুঝি ভাবো তোমাকে দোহন করবার জন্যই আমি তোমার কাছে আসি ? টাকা তুমি আমায় দিয়েছো অনেক স্বীকার করি—কিন্তু ক'টা টাকা আমি চেয়ে নিয়েছি তোমায় জিজ্ঞাস, করি ? তোমায় নেহাৎ আপনার ভাবি ব'লে হেলায়-ফেলায় তোমার কাছে দু'চারটা টাকা চাইতাম, কারণ জানি তা' দিতে তোমার বাধে না, বরং তুমি বড়মান্‌ষী দেখিয়ে আনন্দ পাও—।"

তাহার কথার শেষভাগের অকারণ বিষটুকু বিজয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমাকে বকবার জন্যই কি তুমি এতদিন পরে হঠাৎ এসে আমার বাড়ী চড়াও করলে নাকি ? খুলে বলই না তোমার দায়টা কি ?

অত কথা না ভেবেই আমার মনে হয়েছিল হয়তো তোমার টাকার দরকার।” তারপর চুপ করিয়া মনে মনে বলিল, “তাই পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আয়ো দু’একবার তোমার লক্ষ্যে অর্থের অপব্যয় ক’রতে হচ্ছে।”

হঠাৎ যেন তাহার কথায় চকিত হইয়া তরু কহিল, “না বিজয়, তোমায় বক্‌তে আসিনি—কিন্তু দায় কি শুধু এক টাকারই হয়, প্রাণের দায় ব’লে কি একটা জিনিস নেই?”

তরু কি বলিতে যাইতেছে মনে করিয়া ভীত হইয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—“তার মানে?”

“প্রাণের দায়—বন্ধুত্বের দরদ জিনিসটা কি একেবারেই তুচ্ছ? তুমি না হয় এ দুমাস আমাদের খোঁজটা না নিয়ে দিব্য আনন্দে দিন কাটিয়ে এলে, অথচ মনে পড়ে আমায় অসুখে দেখে গিয়েছিলে?—কিন্তু আমি যদি তোমার সংবাদ নেওয়ার জন্য একটু উৎসুক হ’য়েই পড়ি, তবে কি আমার সেটা, অত্যন্তই অন্যায় হবে?”

“ওঃ—” বলিয়া নতমুখে বিজয় নখ খুঁটিতে লাগিল।

“মনে পড়ে কি বিজয় উপ্‌রো-উপরি দু’দিন আমাদের দেখা না হ’লে তিন দিনের দিন কত অস্থির হ’য়ে তুমি আমার ওখানে যেতে, নয় চিঠি দিতে; সে-তুমি আজ দু’ দুটী মাস আমি মানুষটা মরেছি কি আছি এ খবর যদি না নাও এবং তাতে যদি আমার একটু দুঃখই হয়—তাতে নাটক কচ্ছি বলা চলে কি? তুমি হয়তো ভাব্‌ছ আমি ভড়ং করতে এসেছি—তা ভাবা তোমারি শোভা পায়—কেননা প্রথম পরিচয়ের সময় ঘনিষ্ঠতাটা আমি গায়ে পড়ে’ করতে যাই নি। তাতে জলসেক তুমিই করেছিলে; কিন্তু এখন সুবিধা বুঝে এম্‌নি ক’রে সরে দাঁড়িয়ে ভালোমানুষ সাজ্‌তে চাইলে কি সেটা ভালো দেখাবে?”

কথাগুলি কিছুই নয়—বরং পরম স্নেহভরে অভিমানের অভিযোগ, কিন্তু ইহারই মাঝে মাঝে যে দুই এক ছিটা বিষ ছিল তরুবালার কথায়, তাহার অস্তিত্ব সে তো পূর্ব্বে কোনদিন লক্ষ্য করে নাই। তরুবালা নিজের মনের তিক্ততায় কথাগুলি চাপিয়া না রাখিতে পারিয়া বিজয়কে বিস্মিত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তাহার উপযুক্ত জবাব দিবার কিছু ছিল না। সত্যই তো সে-ই ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার পরে সত্যই তো সে-ই এমন অশোভনভাবে এতদিন তাহার কিছুমাত্র সংবাদ লয় নাই। তাই সে তরুবালার খোঁচাগুলি নিঃশব্দে হজম করিয়া কহিল, "শরীর ও মন দুইটাই নানাকারণে ভালো ছিল না ব'লে তোমাদের ত্যক্ত ক'রতে যেতে ইচ্ছা হয় নি।"

গলার স্বরে আত্মনিবেদন ধ্বনিত করিয়া তরু কহিল, "তারি ফলে বিজয়, আজ অযাচিতভাবে তোমার দুয়ারে এম্‌নি ক'রে আজ নিজেকে টেনে এনেছি। তুমি হয়তো ভোলো নি যে গান গাইতে ছাড়া তোমার বাড়ীতে আমি কখনও আসি নি এবং আজ বোধ হয় এই ভেবেও বিরক্ত হচ্ছ যে এতবড় সাহস আমার কি ক'রে হোলো যে এভাবে তোমার সঙ্গে ড্রয়িং-রুমে ব'সে বন্ধুত্বের দাবীতে গল্প করবার স্পর্দ্ধা করতে পারি! দরজার পানে তোমার পুনঃ পুনঃ সশঙ্ক দৃষ্টি আমার চোখ এড়ায় নি—তুমি ভেবে ভয়ে সারা হ'চ্ছ যে হঠাৎ কে এসে তোমার সঙ্গে আমায় এমনি ভাবে কথা কইতে দেখে তাজ্জব হ'য়ে যায়। কিন্তু ভয় নেই—" বলিয়া ড্রয়িং-রুমের প্রবেশদ্বারটা খিল-বন্ধ করিয়া আসিয়া বলিল, "কিন্তু ভয় নেই, দরজা বন্ধও ক'রে এলাম—আর বেশীক্ষণ তোমায় আমি বিরক্তও করব না।... এখন বল তোমার শরীর কেমন আছে? দেহ মন ভালো নাই বল্‌ছিলে কেন?"

বিজয়ের আজ এই গণিকা নারীর ঘনিষ্ঠতায় ও সংসর্গে সত্যই অশুচি-

বোধ হইতেছিল, কিন্তু উপায় নাই—কৃতকর্ম্মের এ ফলভোগ তো করিতেই হইবে। সে ভাবিতেছিল, সত্যই কি স্পর্দ্ধা সে ইহার হইতে দিয়াছে যে বন্ধু হিসাবে তাহার মত মানুষের বাড়ীতে আসিয়া উঠিতে এ নারী সাহস পাইয়াছে!

তরুবালার প্রশ্নের উত্তরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "কেন আবার—দেহে কোথাও অসুস্থতা আছে তাই—"

বিজয়ের কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া দুঃখিতস্বরে তরু বলিল, "অসুস্থতা তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার কারণটা কি? ডাক্তার টাক্তার কি দেখাও নি?"

"না—"

অভিযোগের স্বরে তরুবালা কহিল, "তোমার দেহের উপর অযত্ন ক'রবার বদ্ দোষটা আর গেল না—আমি তোমার খবরদারী করতে থাক্‌তে পারতাম তো তোমায় দুরস্ত রাখ্‌তে পারতাম—" এবং একটু মৃদু হাসির সঙ্গে ছোট্ট একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু তা' তো আর হবার নয়—"

হাসির পিছনে নিশ্বাসটুকু শ্রুতি এড়াইবার কথা ছিল না—বিজয়েরও এড়াইল না। এ প্রকার সহানুভূতির বাড়াবাড়ি তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সে যখন এরকম ব্যবহার লইয়া কৌতুক করিতে পারিত তখন এ রমণী এ রকম অভিনয় কখনো করে নাই। এখন কৌতুক না হইয়া আশঙ্কা ও ভয় হয়, পাছে আবার সে কোন কলঙ্কে জড়াইয়া পড়ে—তারপর কোনদিন কোন প্রকারে সে কথা যদি রমার কানে ওঠে!"

সে বলিল, "যা হবার নয় তা' নিয়ে আর দুঃখ ক'রে কি হবে?"

তরু বলিল, "কেন আত্মীয়স্বজন যারা আছে তারা কি একটু চোখ রাখতে পারে না ?"

"মামার শালা পিসের ভাই গোছের আত্মীয় ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই তা তো তুমি জানোই—তা নইলে কি আর আজ এমনি ক'রে এসে আমার সঙ্গে কথা কইবার ফুরসুৎ পেতে ?"

তরু স্পষ্ট বুঝিতেছিল বিজয় তাহার উপস্থিতি পছন্দ করিতেছে না—আর ভিতরে ভিতরে পুড়িয়া মরিতেছিল। কিন্তু সে বেফাঁস কথা বলিয়া বসিবার পাত্রী নহে—শুধু বলিল—"আমি বল্‌ছিলাম পয়সার তাঁবেদার আত্মীয়স্বজনের তো বড়লোকের অভাব হয় না—তারা এত নিমকহারাম হয় কি ক'রে যে যার খাই-পরি তার পানে একবার তাকাই না—তাই ভাবছিলাম।"

বিজয়ের আর সহ্য হইতেছিল না। ইজি-চেয়ারটার উপর সটান হইয়া পিঠ এলাইয়া দিয়া নিজের হাতে-বাঁধা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঃ প্রায় দশটা বাজে। আর আজ মাথাটাও এমন ধরেছে—" বলিয়া আড়চোখে একবার তরুবালার দিকে চাহিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল যে তাহাকে বিদায় করিবার এ ইঙ্গিতটা সে কি প্রকারে লয়।

উত্তরে তরু আসন ছাড়িয়া উঠিল এবং কোন কথা না বলিয়া বিজয়ের চেয়ারের পিছনে গিয়া তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ চুল যেখানে কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তর্জ্জনী ও মধ্যমা দিয়া সেখানকার চুলগুলি সরাইয়া অত্যন্ত মাথা নীচু করিয়া সেইখানটায় চাহিয়া বলিল—"ইস্‌ তাই ত'—কপালের শিরাগুলা যে ফুলে উঠেছে!" এবং স্পর্শে সোহাগ ঢালিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় কহিল—"পাশের পড়ার ঘরটায় সেই সোফাটাতে চল না কেন—একটু মাথা টিপে দেবো এখন—"

বিজয় ফাঁপরে পড়িয়া বলিল— "না—ও খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমুতে

পারলেই সেরে যাবে এখন—টেপবার কোনো দরকার নেই। বেয়ারাকে দিয়ে তোমার ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিচ্ছি—”

তাহাকে বিদায় দিবার ইঙ্গিতের স্পষ্টতায় তরুবালা বিজয়ের পশ্চাতে অপমানে লাল হইয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল এবং একটু সামলাইয়া পরমুহূর্ত্তেই বলিল, “আমার যাবার এত তাড়া কি? তবে তোমার ঘুম্‌লেই যদি ভালো হবে বোধ হয় তবে তাই ভালো। আচ্ছা, আমি আসি গিয়ে। রাস্তায় পড়ে’ ট্যাক্সি একটা আমি নিজেই ডেকে নেবো এখন—” বলিয়া দ্বারের দিকে তিন পা’ গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“আস্‌ছে রবিবার বাসন্তী থিয়েটারে অনেকদিন পরে সাজাহান প্লে হচ্ছে—যেও না?”

বিজয় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি সাজবে—পিয়ারা?”

“হ্যাঁ—”

“আচ্ছা যেতে চেষ্টা করব—” এবং যাইবার সমায় তরুবালাকে একটু খুসী করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল—“চেষ্টা ক’রব কেন—বিশেষ প্রতিবন্ধক না এলে নিশ্চয়ই যাবো—”

তরুবালা শালটাকে গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, “আর সেদিন প্লে’র পরে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ না হয় তো আমার ওখানে অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্য একবার যেয়ো—” কথা বলিতে বলিতে বেশ-ভূষা ঠিক করিতে গিয়া তাহার বক্ষের অঞ্চল দুইবার খসিয়া পড়িয়া কণ্ঠ ও বক্ষার্দ্ধের তুহিন-শুভ্রতা বুক-কাটা রেশমের ব্লাউসের ভিতর দিয়া দৃষ্টিগোচর করিয়া দিল—আজঙ্ঘা-বিলম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণ মুক্তবেণী দুই তিনবার ওলট-পালট খাইয়া পিঠের উপর এলাইয়া পড়িয়া স্থির হইল, মস্তিষ্কের ইতস্ততঃ সঞ্চালনে কানের হীরার দুল বিজলী বাতির নীচে কাঁপিয়া কাঁপিয়া চমক দিতে লাগিল।

বিজয় তাহার দিক হইতে মাটীর পানে চাহিয়া অস্ফুটে জবাব দিল, "আচ্ছা।"

খিল খুলিয়া তরুবালা বাহির হইয়া গেল বিজয় নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া হাতলের উপর কনুই ও গালে হাত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—পূর্ব পাপের এইবার প্রায়শ্চিত্ত সুরু হইয়াছে। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া যে সমস্ত বস্তুর নিকট হইতে দূরে থাকিতে চায় এখন "কমলি নেহি ছোড়্‌তা" গোছ হইয়া সেইগুলিই তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেছে এবং তাহার নিজের সামর্থ্য এত কম যে ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেও সে যেন অপারগ!—নহিলে, নহিলে এই রমণী এতক্ষণ ধরিয়া তাহাকে উৎপাত করিয়া গেল, একটি কথাতেই তো সে তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় করিতে পারে—কেন কিসে এই গণিকার সহিত তাহার বাধ্যবাধকতা যে তাহাকে তাহার সমীহ করিয়া চলিতে হইবে? কিন্তু সেই একটি কথাই যে সে কহিতে পারে না—ওষ্ঠদ্বয় যেন বন্ধ হইয়া আসে। তরুবালা বলিয়া গেল—প্রথম ঘনিষ্ঠতা তো সে গায় পড়িয়া করিতে আসে নাই—নাই আসিল, কিন্তু তাহাদের জাতীয় মেয়েমানুষ তো বিপথগামী যুবাদের খেলা করিবার বস্তুই!—কিন্তু এভাবে নিজের পূর্ব্বকৃত অপরাধ ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিলেও সে আশ্বাসে সে শান্তি পাইতেছিল না। সত্যি এইভাবেই বুঝি কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। এমন সময় ভৃত্য বিজয়কে খাইতে ডাকিল; সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া সুইচ্‌ টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইতোমধ্যে বিজয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল রবিবার সে বাসন্তী থিয়েটারে যাইবে না এবং তরুবালার বাড়ীতেও যাইবে না। অবশ্য সে কথা দিয়াছে, কিন্তু তাহার দেহ ও মনের আজকাল যে অবস্থা, তাহাতে অসুস্থতার অজুহাতে যদি সে না যায়—সেটা তেমন মিথ্যাচরণও হয় না। শনিবার সে তরুবালার নামে এক পত্র দিল:

'আমার শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছি বলিয়া কাল থিয়েটারে যাইতে পারিব না—তোমার বিজ্ঞপ্তির জন্য লিখিলাম। ইতি'—

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ীর বাহির হইল না। কি জানি খেয়ালী রমণী যদি সেদিনকার মত তাহার বাড়ীতে আসিয়া—থিয়েটারের আগেই হোক বা পরেই হোক হানা দেয়! রবিবার দিন ম্যাটিনী, তাতে পিয়ারার অভিনয় তো নাটকের দুই তৃতীয়াংশ হইতেই শেষ—বেশী রাত হইবে না, সুতরাং তখনই তাহার বাড়ী বহিয়া যদি সে ট্যাক্সি লইয়া রওনা হইয়া আসে—তাহা তাহার পক্ষে এমন বিচিত্র হইবে না।

এই রমণী আবার আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে—কল্পনা করিতেও তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং সে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছিল যে আজ যদি সে আসে সে স্পষ্ট বলিয়া দিবে—তাহাদের সহিত আর সে কোনো সম্বন্ধ রাখিতে চায় না; সে তাহার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সে যেন আর না আসে—কিন্তু পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা—সে আর তাহাকে বিরক্ত করিবে না এই সর্ত্তে—দিতে রাজী আছে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিল, রাতও কাটিল, কিন্তু তরুবালা আসিল না। তখন সে আপন মনে একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল;

ভাবিল—'ওকে এখন আমি কি চক্ষে দেখি তা সেদিন স্পষ্ট বুঝে গিয়েছে—হয়তো এখন আর এদিকের ছায়াও মাড়াবে না। আঃ বাঁচা গেল।'

তরুবালা সেদিন আসিল না—কিন্তু আসিল পরদিন। তখন সাতটা, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বিজয়ের গৃহে পৌঁছিয়া সে জানিল বিজয় বেলা তিনটায় বাহির হইয়া গিয়াছে। মুচিপাড়ায় একটা নৈশ বিদ্যালয় খোলা উপলক্ষে কি সভা আছে—সেখান হইতে আরো কোথায় কোথায় যাইয়া ফিরিতে প্রায় তাহার আটটা হইবে। তরু ঠিক করিল এই এক ঘণ্টা সে ড্রয়িংরুমের পাশে বিজয়ের সেই পড়ার ঘরটায় অপেক্ষা করিবে। দারোয়ান তাহাকে সেই ঘরে রাখিয়া আসিল।

তরুবালা ঘরে ঢুকিয়া সময়টা কি করিয়া কাটাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া সদ্য অধিকৃত চেয়ারখানা ছাড়িয়া দেওয়ালের ছবিগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। একে একে সবগুলি দেখা শেষ হইলে, আসবাব-পত্রগুলির দুই একটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। তারপর প্রকাণ্ড আর্শিখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু মুচ্‌কি হাসিল। তাহার সারা দেহের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি যেন সেদিন তাহার মনের কথ্যে সফেন তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আপনাতে আপনি সম্বৃত হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। তাহার সেদিনকার বেশভুষা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার নহে। পরণে চওড়া পাড়ের মিহি ঢাকাই শাড়ী—গায়ে শুদ্ধ মাত্র শাদা মস্‌লিনের ফিন্‌ফিনে একটা ব্লাউজ—তাহার ভিতর দিয়া বরাঙ্গের অনিন্দ্যশুভ্র বর্ণ ও পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পায়ে জরির কাজ করা নাগরা জুতা। সেদিন সে বেণী বাঁধে নাই—মাথা ঘষিয়া ফুরফুরে চুলের রাশ হাতে কুণ্ডলীবদ্ধ করিয়া পিছনে খোঁপা বাঁধিয়াছে—দুই একটা চূর্ণ কুন্তল

গোলাপী গণ্ডের উপরে লুটোপুটি খাইতেছিল ও আশেপাশে উড়িতেছিল। কুঁদিয়া কাটা পাতলা ঠোঁট দু'খানি পানের রসে টুক্‌টুকে রাঙা; কিন্তু দাঁতগুলি কুন্দ ফুলের মতো ধব্‌ধবে শাদা, পানের রসের চিহ্ন মাত্র নাই। হাতে দুইগাছা মাত্র ব্রেসলেট, পীন পয়োধরের উপরে সরু একটা পান্নার লকেটওয়ালা সোনার চেন লতাইয়া পড়িয়াছে, কানে সেই হীরার দুল—গায়ে সেইদিনকার সেই শালখানিই যেমন তেমন করিয়া জড়ান।

আর্শির দিকে চাহিয়া সে একবার তৃপ্তির হাসি হাসিল। তারপর কি ভাবিয়া চেয়ারে না বসিয়া সোফাখানার উপরে গা এলাইয়া দিল। শোফার উপরে শাদা ঝালর দেওয়া দামী চাদর পাতা। শিয়রের দিকে হিমশুভ্র রেশমের কাজ করা আবরণে মোড়া একটা বড় বালিশ, তাহার মাঝখানটা মাথার তেলে ঈষৎ ময়লা হইয়াছিল। তরুবালা সেটাকে টানিয়া লইতেই সেটা হইতে জবাকুসুম তৈলের ঘ্রাণ পাইল। সে জানিত বিজয় জবাকুসুম তৈল মাখে এবং একথা মনে হইবামাত্র সে বালিশটাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ঘ্রাণ লইয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল বিজয়ের পাশে সে এই শয্যার ভাগিনী হইয়াছে; বিজয় তাহাকে কত আদর করিল—সোহাগ করিল—সাধ্যসাধনা করিল তাহার ওষ্ঠে একটি চুম্বন দিবার জন্য—সে অভিমান করিয়া কিছুতেই ওষ্ঠ তুলিয়া ধরিল না, বালিশে মুখ গুঁজিয়া রহিল—কেন সে এতদিন এমন করিয়া তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছে?—অভিমান শত্রু হইয়া তাহাকে চুম্বন পাইতে দিল না বটে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠ নিরস্ত রহিল না, পার্শ্বশায়ী দয়িতের ওষ্ঠ-উদ্দেশে লুকাইয়া সহস্র চুম্বনে উপাধানকে মণ্ডিত করিল।

এমন সময় ঢং করিয়া দেয়ালের বড় ঘড়িটাতে সাড়ে সাতটা

বাজিয়া তাহাকে বাস্তব জগতে ফিরাইয়া আনিল। সে দেখিল নিজের উন্মত্ততায় বিছানার চাকরটাকে সে বিস্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে—সেটাকে ঝাড়িয়া ভাল করিয়া পাতিল এবং বালিশটাকে যথাস্থানে রাখিয়া তখন টেবিলের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল।

বসিবার অত্যল্প পরেই সে লক্ষ্য করিল—টেবিলের উপরে একখানা রূপার ট্রে'র মধ্যে খানকয়েক না-খোলা চিঠি—পড়িয়া রহিয়াছে। সে বুঝিল এগুলি বিকেলবেলার বিটের চিঠি—বিজয় বাহির হইয়া যাইবার পর আসায় বেয়ারা তাহার ট্রের উপরে রাখিয়া গিয়াছে। স্ত্রীসুলভ কৌতূহলবশতঃ সে চিঠিগুলি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল—বিশেষতঃ এগুলা যখন বিজয়ের চিঠি। দেখিয়া দেখিয়া একখানা করিয়া চিঠি ট্রেতে রাখিতে রাখিতে হঠাৎ একখানা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার উপরে সুছাঁদে পরিষ্কার মেয়েলী হরপে লেখা, "শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার দত্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু।" ডাকঘরের সিল রহিয়াছে চক্রধরপুরের। দেখিয়া হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল—কে এই চিঠি লিখিল ?—একবার ভাবিল তাহার পিসিমা লিখিতে পারেন—তখনই আবার মনে হইল তাহার পিসিমা তো বহুদিন হইতে তাঁহার কলিকাতার বাসাতেই আছেন সে খবর পাইয়াছিল। তবে ?—পরের চিঠি খুলিয়া পড়া কি অন্যায় তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই তখন তাহার ছিল না—সে ক্ষিপ্র কম্পিত হাতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া চিঠি ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া পড়িল—পড়িবার আগে দরজায় খিল দিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে এইরূপ লেখা :—

শ্রদ্ধাস্পদেষু, প্রিয় বিজয়বাবু,

আমি পিতৃহীন হইয়াছি। কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া পরশু বাবা হঠাৎ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শেষ সময়ে তিনি পুনঃ পুনঃ আপনার কথা বলিয়াছিলেন।

বুঝিতেই পারিতেছেন আমি কি বিপদে পড়িয়াছি। হঠাৎ লোকান্তরিত হওয়ায় তিনি আমার সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় আপনার বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে এখানে দয়া করিয়া একবার আসিবেন কি? —আমি আমাদের বাড়ীতেই আছি। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাবার স্মৃতিজড়িত এ বাড়ীখানি ত্যাগ করিয়া চক্রধরপুর থাকিয়া অন্যত্র গিয়া থাকিতে মন সরিল না। ইতি শ্রীরমা সেনগুপ্ত।

পুঃ—বাবা মৃত্যুকালে আমাদের বিবাহে স্ব-ইচ্ছায় সম্মতি দিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে আপনার সম্মতি-অসম্মতি না খতাইয়া একথা বলিব কিনা ইতস্তত করিতেছিলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম তুচ্ছ আত্মাভিমানের খাতিরে একথা গোপন করিবার কোন হেতু নাই। ইতি।"

মুহূর্তে তাহার সুখস্বপ্নের রেশ কর্পূরের মতো উবিয়া গেল। কেন এতদিন বিজয় আর চক্রধরপুর ফেরে নাই, কেন সে আর তাহার ওখানেও যায় নাই—তাহার দেহমনের অসুস্থতার গোড়া কোথায়—এ সমস্ত এক লহমায় তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে চিঠিখানা হাতের মুঠার মধ্যে করিয়া শূন্যভাবে তাহার দিকে মিনিট-খানেক চাহিয়া রহিল, পরে হঠাৎ ত্রস্তে উঠিয়া ঘরের দরজা যেমন খোলা ছিল খুলিয়া রাখিল। দরজা খুলিয়া সে আর বসিল না—বামহাতে মুষ্টিবদ্ধ পত্র লইয়া সে খাঁচায় আবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহীর মত ঘরে ইতস্তত পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ পত্র সে কিছুতেই বিজয়ের হাতে পৌঁছিতে দিবে না; আর—আজ—আজই তাহার শেষ চাল চালিবার দিন; হয় বাজী মাৎ করিবে—নয়, নয় তো তাহা চটিয়া যাইবে। তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে

—থাকিয়া থাকিয়া সুকুমার অধরোষ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে আর একবার যাইয়া আর্শির সম্মুখে দাঁড়াইল—নিজের ভুবনবিজয়ী মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবির দিকে আপাদ-মস্তক চাহিয়া তাহার ওষ্ঠের কোণায় একবার শুষ্ক একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। এমন সময় ভেঁপু বাজাইয়া একখানা মোটর বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকিল। ঘরের জানালা দিয়া ফটক দেখা যায়। সে ঈষৎ গলা বাড়াইয়া দেখিল বিজয়ই আসিয়াছে বটে। ঘড়িতে পৌনে আটটা বাজিয়াছে। ত্রস্তে পত্রখানা কাপড়ের তলে সাবধানে লুকাইয়া ফেলিয়া সে যথাসাধ্য শান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লগিল।

ফটকে দারোয়ান তরুবালার আগমনবার্ত্তা তাহাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বৈকালিক ডাকের চিঠি লইতে পড়ার ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ তরুবালাকে দেখিয়া বিজয় বিস্ময়ে কহিয়া উঠিল—"এ কি। তুমি এখানে কখন এলে?"

মধুর হাসিয়া হাতের বইখানা রাখিয়া তরুবালা কহিল, "কেন দারোয়ান বলেনি?—আমি তো প্রায় একঘণ্টা থেকে তোমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছি।"

"একঘণ্টা থেকে—?"

"হ্যাঁ—যাক্ সে কথা। তোমার শরীর কেমন? ভেবেছিলাম কালই একবার আস্‌ব, কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ল না।"

ক্ষীণস্বরে বিজয় বলিল, "আজ এক রকম আছি"—তাহার পূর্ব্বের স্পষ্টকথা বলিবার সকল দৃঢ়সঙ্কল্প যেন এখন ভাঙিয়া পড়িতেছিল।

"কিন্তু কাল কি এতই শরীর খারাপ হয়েছিল যে বাড়ী থেকে বেরুতে মাত্র পারলে না? রবিবারের ম্যাটিনী তো দশটায় শেষ হ'য়ে যেতো—না

হয় আমার ওখানে না-ই যেতে। তোমার শরীর ভালো নয় জান্‌লে কি আমি পীড়াপীড়ি করতাম ?"

"সে তো তোমায় চিঠিতেই লিখেছি—পারলে আমি যেতাম—তুমি যদি বিশ্বাস না কর—"

বাধা দিয়া তরু কহিল, "বিশ্বাস ক'রব না কেন ?—কিন্তু কালকের এই অসুস্থতার পরে আজকে পাঁচ ঘণ্টা হৈ হৈ করে যে এলে—এটা কি ভালো হোলো ? একবার ভেবেছিলাম এতক্ষণ ব'সে না থেকে চলেই যাবো ; তারপর আবার ভাবলাম তোমায় আজ সত্যিই একটু বকুনি দিয়ে যাবো। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?—বোস"—বলিয়া একখানা চেয়ার তাহার সম্মুখে ঠেলিয়া দিল। সে চেয়ারে না বসিয়া বিজয় নিঃশব্দে যাইয়া শোফার উপরে বসিল। শালটা চেয়ারের উপর খুলিয়া রাখিয়া তরুবালা উঠিয়া পাখার সুইচ্‌টা টানিয়া দিল। আবার আসিয়া বসিবার বেলা মাথার কাপড় খসিয়া গেল,—কিন্তু সে তাহা আর তুলিয়া দিল না।

তাহার বসিবার রকম দেখিয়া বিজয় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল—আজ আবার এ কতক্ষণে উঠে তাহার ঠিক কি ? আজ পাঁচঘণ্টা ছুটাছুটি করিয়া তাহার সত্যই অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছিল—কথা কহিতে মোটে ইচ্ছা হইতেছিল না। সেদিনকার মত যদি তরুবালা আজ আবার নার্সগিরি করিতে বসিয়া যায় তবেই তো হইয়াছে !

এ-ও-তা দুই চারিটা কথা কহিতে কহিতে বিজয় মাঝে মাঝে ডানহাত দিয়া যে নাকের ডগা চাপিয়া ধরিতেছে তাহা তরু লক্ষ্য করিয়াছিল। সে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "রোদের মধ্যে দেশহিতৈষণায় বেরিয়ে মাথাটি বুঝি ধরিয়ে এসেছো ?"

"না—হ্যাঁ—একটু বেদনা করবে বৈকি ?"

উত্তরে তরুবালা সোফার পাশে যাইয়া বিজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া মধুর কটাক্ষ হানিয়া বলিল—"তুমি শোও, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি—"

বিজয় শশব্যস্তে কহিল—"না, না, দরকার নেই—"

গায়ের কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া স্বীয় বস্ত্রভার-পীড়িত দেহ-সুষমায় মস্‌লিনের জামার আব্‌রু মাত্র রাখিয়া—সে টেবিলের উপরে পূর্ব্ব লক্ষিত ও-ডি-কলোনের শিশিটা বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল—"আচ্ছা টেপবার দরকার না আছে একটু ও-ডি-কলোন দিয়ে দি—" বলিয়া ঘরের কোণে একটা গেলাসের মধ্যে জল গড়াইতে লাগিল।

বিজয় পূর্ব্ববৎ কহিল, "না-তাও দরকার নেই—"

"খুব আছে—" বলিয়া একরকম জোর করিয়াই বিজয়কে হঠাৎ কাৎ করিয়া বালিশটা গুঁজিয়া দিল।

এবার বিজয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। পরক্ষণেই সে চট্‌ করিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি সেদিন থেকে এম্‌নি ক'রে আমায় জ্বালাচ্ছ কেন বল ত?"

ছল ছল চোখে তরু কহিল, "আমার ওপর রাগ কোরো না। আসি ব'লে কি এমন ক'রে বক্‌তে হয়?"

ইহার উপর রাগ করা চলে না। গলার আওয়াজ একটু মোলায়েম করিয়া বিজয় কহিল, "আগে তো তোমায় সাধ্যসাধনা ক'রে পাওয়া যেতো না—আর আজকাল এত দরদ—এর মানেটা কি. তরু?" বিজয় তখন পর্য্যন্তও ভাবে নাই এই রমণী তাহাকে ভালোবাসে। সে ভাবিতেছিল ইহারা পুরুষ লইয়া খেলাইয়া আনন্দ পায়—সে হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া পুনরায় তাহাকে হাত করিবার জন্য এই রমণী এইসব নূতন জাল বিস্তার করিতেছে।

উত্তরে তরুবালা কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তখন ভাবতাম আমিই মহাজন, আজ যে দেখছি আমিই ভিখারিণী হ'য়ে পড়েছি বিজয়!"

'বিজয় মনে মনে বলিল—'চমৎকার নাটক করতে পারে বটে!' ইহা মনে করিয়া ঘৃণা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল এবং প্রথমে তাহাকে স্পষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিতে যে বাধ বাধ ঠেকিতেছিল এখন আর তাহা রহিল না। তাই সে তখন বলিল—"ছ্যাখ তরু, ওসব কথায় ভোলবার দিন আমার গিয়েছে। আমি স্থির করেছি আগের মত্ততা সব ছেড়ে এবার জানোয়ার থেকে একটু মানুষ হবার চেষ্টা ক'রব। তুমি আর আমার কাছে এসো না, কি আমাকেও প্রত্যাশা কোরো না। তোমায় আমি হাজার পাঁচেক টাকা দিচ্ছি—এ নিয়ে তুমি আমায় রেহাই দাও। আমি নিজের দোষ সাফাই ক'রে তোমার কাছে ভালোমানুষ সাজতে চাই না, আমি তোমার কাছেও অপরাধী এবং সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুমি যদি দশ হাজার টাকাও চাও আমি তা-ও দিতে কুণ্ঠিত হব না।"

কাতরকণ্ঠে তরু কহিল, "আবার তুমি সেই টাকার কথা তোল। তোমার শপথ, তুমি ভেবে দেখ—সত্যিই অর্থের জন্য তোমায় আমি—আমি ভালো—হ্যাঁ তোমায় আমি ভালোবেসেছি কিনা। তুমি খুসী হ'য়ে যখন তখন ইনাম দিয়েছ—তোমার সেটা খেয়াল-খুসীর দান ছিল, কিন্তু আমার কাছে তার মূল্য ছিল অমূল্য। তুমি কোনদিন কাঁচা টাকা আমার হাতে দাও নি—হয় মোহর দিয়েছ, নয় নোট দিয়েছ—তুমি বিশ্বাস ক'রবে কি বিজয়, প্রাণে ধরে' তার এক কাণাকড়িও আমি খরচ ক'রতে পারি নি। কিন্তু ঐ যে বল্লাম—তখন আমার ধারণা ছিল আমি হ'লাম মহাজন, তুমি ছিলে খাতক। তাই জয়ের গর্ব্বে আত্মাভিমান চরিতার্থ ক'রবার জন্য আর সবার মত তোমার কাছ থেকেও দু' একদিন টাকা

চেয়ে নিয়েছি—কিন্তু আমার তখনি ভয় হোতো যে সে জয় বুঝি আমার সত্যিকার জয় নয়—" বলিয়া তরু কাঁদিতে লাগিল।

এইবার বিজয়ের মনে ঘা লাগিল। এ তো নিছক অভিনয়ের মতো শুনাইতেছে না। সত্যিই কি তবে এই নারী তাহার কাছে বিকাইয়াছে? সে ভাবিয়া দেখিল—স্ক্রুর প্যাঁচ কষিয়া এই নারী তাহার নিকট হইতে সত্যিই টাকা আদায় করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। সে একটু পরে বলিল, "হ'তে পারে তুমি আমায় ভালোবাসো; কিন্তু আমাদের মিলন যে সমাজে হ'তে পারে না এ তুমি বেশ বোঝো। বিশেষত, আমি যখন তোমায় ভালোবাসি না, ভালোবাসতে পারি না। এ অবস্থায় আমাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই কর্ত্তব্য।"

দুই হাতে চোখের জল মুছিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মহিমময়ী মূর্ত্তিতে বিজয়ের পানে চাহিয়া তরু কহিল, "কেন ভালোবাসতে পারবে না বিজয় —আমি কি কুৎসিৎ?"—বুকের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "কতজনের ঈপ্সিত এ প্রাণ আর দেহের যত মধু যত গন্ধ তোমার পায়ে উৎসর্গিত হবার জন্য আকুলি বিকুলি ক'রছে তুমি তা' প্রত্যাখ্যান করবে, এত নিষ্ঠুর তুমি? বিজয়, বিজয়—আমায় তোমার কাছ থেকে তাড়িও না, তাহ'লে আমি বাঁচব না—" তাহার গলা আবার ভারী হইয়া উঠিল—"তোমার অত বড় বুকের একটু কোণায় আমার স্থান হবে না?—বিজয়—বিজয়—আমাকে নাও—" বলিয়া ছুটিয়া বিজয়ের বক্ষের উপর পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে বক্ষ জড়াইয়া উন্মাদের মত ওষ্ঠে গণ্ডে কণ্ঠে চুম্বন করিতে লাগিল।

"না, না, তরু—এ হ'তে পারেনা, এ হবেনা"—বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তরুর দুই বাহু ধরিয়া বিজয়কুমার তাহাকে বুক হইতে ঠেলিয়া দিল!

তখন উন্মাদিনীর মত সে বিজয়ের পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল,

"আমায় বুকে স্থান না দিতে পার, পায়ে স্থান দাও—আমি তোমার বাড়ীতে দাসী হ'য়ে থাক্‌ব, আমায় তাড়িও না।"

তখন তাহার কেশ-জাল বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অঞ্চল মেঝের উপর লুটাইতেছে, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ব্লাউজের বোতামগুলি খুলিয়া বক্ষ নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। নগ্নবক্ষে বিজয়ের পা চাপিয়া ধরিয়া সে কেবল বার বার কহিতেছিল—"আমায় তাড়িওনা, তাড়িওনা।"

পা সহজে ছাড়াইতে না পারিয়া বিজয় অবশেষে তাহাকে ভয় দেখাইয়া বিরক্ত-তিক্তকণ্ঠে কহিল—"পা' ছাড় তরু, কথা যদি না শোনো তবে শেষে চাকরবাকর ডাকতে হবে—তা কি ভালো হবে ?"

হঠাৎ পা' ছাড়িয়া আবার তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তরু মিনতির স্বরে বলিল, "ওগো আমায় নাও—একটি দিনের জন্য—একটিবার আমায় চুমু দাও—" বলিয়া ওষ্ঠ পাতিয়া দিল।

তাহার উদ্যত মুখ এক হাতে ও বাহু এক হাতে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বিজয় সরিয়া দাঁড়াইতেই ধাক্কা লাগিয়া টেবিলের এক কোণায় মাথা ঠুকিয়া তরুবালার খানিকটা কাটিয়া গেল।

আঘাত পাইয়াছে দেখিয়াও বিজয় ত্রস্তে সাহায্য করিতে সাহস পাইতেছিল না—আবার সেই সুযোগে যদি পাগলিনী তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কিন্তু এবার আর তরুবালা অগ্রসর হইল না। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া এক হাতে মাটি হইতে আঁচলটা টানিয়া লইল ও অন্য হাতের তর্জ্জনী কম্পিত করিয়া চেঁচাইয়া বলিল—"বটে, এতদূর—আমায় ভালোবাসতে পারবে না—পারবে কাকে শুনি—রমা সেনগুপ্তকে ?—আচ্ছা দেখা যাবে।"

বিস্ময় বিমূঢ়কণ্ঠে বিজয় বলিল, "রমা—রমা সেনগুপ্তকে তুমি জানলে কি ক'রে?" চকিতে তাহার মনে পড়িল গোলাপঝিকে সে চক্রধরপুর ছাড়িবার দিন ষ্টেশনে দেখিয়াছিল। সে কেন সেখানে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিয়াছিল—তাহার এক আত্মীয় সেখানে আছে। মুহূর্ত্তে তাহার উপস্থিতির কারণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিজয় ঘৃণায় ও ক্রোধে আবার জ্বলিয়া উঠিল।

তরুবালা পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল, "আমি সব জানি তোমার ধূর্ত্তামি—ছলে কৌশলে আমার মনপ্রাণসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে—চক্রধরপুর গিয়ে পীরিত করা হচ্ছিল। রমা সেনগুপ্তের জন্য তুমি হায় হায় করে মরছ—আর আমি তোমায় মাথার মণি ক'রে রাখতাম—"

বিজয়ের আর সহ্য হইল না; সেও তীব্রকণ্ঠে কহিল, "ফের রমা সেনগুপ্তের নাম যদি তুমি ও-মুখে উচ্চারণ ক'রবে তোমায় আমি দারোয়ান ডেকে বাড়ীর বার ক'রে দেবো। ভারী যে বড়াই কচ্ছ সর্ব্বস্ব তোমার আমি কেড়ে নিয়েছি—কিন্তু ক'গণ্ডা লোকের সঙ্গে কালও থিয়েটারে ইয়ার্কি দিয়েছ আমায় হিসাব ক'রে একদিন বোলো। বাস্, আজ চুপ—আজ আর কিছু শুনতে চাইনা। তুমি বাড়ী যাও।" বলিয়া বিজয় দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

"মনে রেখো তরুবালা প্রকাশমণি কীর্ত্তনওয়ালীর মেয়ে—সে একথা ভুল্‌বে না—" বলিয়া শালখানা তুলিয়া লইয়া ঝড়ের মতো তরু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছুটিয়া যাইবার সময় বিজয়ের চোখে পড়িল তাহার বাম কপোল বহিয়া সূক্ষ্ম একটা রক্তের ধারা উজ্জ্বল বিজলী আলোতে চিক চিক করিয়া উঠিল। তরুবালার নিজের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

তরুবালা চলিয়া গেলে সোফার উপরে উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিজয় অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তরুবালা ততক্ষণে চলন্ত ট্যাক্সির

পিছনের গদিতে একলা বসিয়া দুই হাত ঘর্ষণ করিতে করিতে বার বার বলিতেছিল, "আমি কি করি—আমি কি করি—" তাহার শুষ্ক চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

১৮

যখন সকলেই বুঝিতে পারিল রমার পিতার জীবনের আশা আর নাই —তিনি নিজেও কতকটা অনুমান করিয়া লইলেন—তখন বৃদ্ধ একান্তে কন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মা, আমার সময় হয় তো হ'য়ে এসেছে, কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেখানের ভাবনার চাইতে তোর ভাবনাটা আমার বড় হ'য়ে উঠেছে। তুই দুষ্টুমী ক'রে বল্‌তিস 'আমায় যখন ছেড়ে যাবে মজাটা বুঝবে' সেটা যে এতদূর সত্য হবে তা কোনোদিন বুঝি নি।"

"তোমার আগে আমি মরব এত বড় স্বার্থপর ইচ্ছা আমি কোনোদিন করি নি; কিন্তু বাবা—আজ ভেবে পাচ্ছি না, তোমায় ছেড়ে আমি কি ক'রে থাকব, কি ক'রে বাঁচব। আমার কি গতি হবে সে চিন্তা ক'রে তুমি দুঃখ পেও না বাবা, তুমি তো ভগবান্‌কে এত ভলোবাস—তাঁরই হাতে আমায় দিয়ে যাও না কেন? তাঁকে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে আমার জন্য তোমার আর কোন ভাবনা আস্‌বে না।" বার বার ছাপিয়া আসা অশ্রু মুছিতে মুছিতে রমার চোখ লাল ও স্ফীত হইয়াছিল।

"ভগবান্‌কে বিশ্বাস যদি করি বল্লে মা! তিনিই জানেন তা করি কি না, কিন্তু তবু যে মা মন মানে না। মন মানে না—মানে না—এ দুর্ব্বলতা তিনি ক্ষমা করুন। কিন্তু আমার উপায়ই বা কি? তাঁর উপরে তোর জন্য নির্ভর করা ছাড়া আর আমার উপায়ই বা কি? এ বাড়ীখানা ছাড়া

আর তো আপনার বল্‌তে আমার কিছুই নেই। তোর মা'র দু' চারখানা গয়না আছে মা তা—"

রমা বাধা দিয়া কহিল, "বাবা, এসময় তুমি আবার ঐ সব ছাই-পাঁশ ভাব্‌ছ?"

"না—না মা, ভাবব না—ভাবব না। আমার মায়ের কথা আমি চিরকাল শুনে এলাম, আর যাবার বেলা আজ শুন্‌ব না? শুন্‌ব বৈকি? কিন্তু বুঝ্‌লি মা—এখানে কোনো দরকার হলে ডাক্তার বোরকার আছেন, রামলিঙ্গম্ আছেন, এঁরা তোর খুব সাহায্য করবেন। বিশেষ ঠেক্‌লে অপরেশের কাছে তুই তোর দরকারের কথা জানাতে লজ্জা করিস্ নি। অপরেশের সঙ্গে আমি এতটুকুনটি থেকে বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত পড়েছি। তার পুত্রবধূ করার সখ তোকে দিয়ে না মিট্‌লেও, সে তোকে মেয়ের মতোই ভালোবাসবে। আমি তাকে কিছু ব'লে যেতে পারলাম না, কিন্তু আমি না বল্লেও সে বুঝবে"—

"এই বুঝি তোমার না-ভাবা। তুমি গেলে ভগবান্ আমায় পথ দেখিয়ে দেবেন এ ভরসা আমি রাখি—তুমি এ সময় আমার কোলে মাথা রেখে একটু তাঁর চিন্তাই কর, আমার সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হয় তাঁরই কাছে বল।"—বলিয়া পিতার মাথা অতি সন্তর্পণে কোলে লইয়া বসিয়া কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ শান্ত শিশুর মত চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তাই—তাই ঠিক মা, ভগবানই তোমায় দেখ্‌বেন। আমার চেষ্টার কি মূল্য আছে?"

একটু পরে আবার বলিলেন, "আর একটা কথা মা—বিজয়—বিজয়ের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয়—'যদি' কেন, দেখা হবেই—তখন তাকে বোলো সেদিন আশাভঙ্গে ও অসংস্থিতচিত্তে তাকে মনোকষ্ট দিয়ে

বিদায় করেছি ব'লে আমিও পরে বড় কম কষ্ট পাই নি। সে নাস্তিক হোক চাই না হোক, ভগবানের চোখে সে তুমি আমি সবই যখন সমান, তখন তার প্রতি অকারণ রূঢ় ব্যবহার করবার আমার কি অধিকার আছে?"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া দম লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই থেকে আমি আর একটা সিদ্ধান্তে এসেছি মা—যে তোমাদের বিবাহে বাধার কিছুই নেই। তোমরা পরস্পরকে চাও এবং যদি মনপ্রাণ দিয়ে চাও, তাই বিবাহ বন্ধনকে সুদৃঢ় করবার জন্য যথেষ্ট। বিবাহ সম্বন্ধে তার ধারণা আমার ভালো লাগে নি—হোক না সে নাস্তিক—কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে চাও আমি তার ঐ অপরাধে তাতে বাধা দিতে পারি না। মা, আমরা মুখে অনেক সময়ে বলি পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করি—কিন্তু বুকে জোর দিয়ে তদনুযায়ী কাজ করতে পারি না। তুই সেদিন বল্লি, ভগবানে বিশ্বাস আন্‌তে তুই হয়তো তার সাহায্য ক'রতে পারতিস্—তার পরেই আমার মনে হোলো—ভগবানের তাই যে ইচ্ছা নয় কে বল্‌তে পারে? মনে হোলো তাঁতে বিশ্বাস থাক্‌লে বিজয়ের হাতে তোকে দিয়ে যেতে আমার সংশয় হবে কেন? আমি নয় সেদিন তোকে 'আগ্‌লে রাখলাম, চিরকাল যে পারছি না—তা তো আজই বুঝ্‌তে পারছি। ক্রমে আমার সংশয় কেটে গিয়েছিল মা—ভেবেছিলাম বিজয়ের হাতে আমিই তোকে দিয়ে যাবো—শুধু ক'টা দিন দেরী করছিলাম তোদের মন পরীক্ষা ক'রতে, তোদের এ আকর্ষণের দৃঢ়তা কতটা হয়েছে তাই দেখ্‌তে। তারপর তার বংশ-পরিচয় ও বাড়ী ঘরের খবরটবর নিতে একবার ক'লকাতা যাব —এ-ও ভাবছিলাম বটে, কিন্তু হঠাৎ তো আমার ডাক পড়্‌ল। কিন্তু যাবার সময় আমি তোদের অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি, তোরা মিলিস্। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তিনিই যন্ত্রী, আমরা তো যন্ত্র মাত্র মা।"

থামিয়া থামিয়া বলিলেও দুর্ব্বল দেহে এ দীর্ঘ বাক্যস্রোতে তিনি অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া স্তব্ধ হইলেন। পিতা তাহাকে কি গভীরভাবে ভালোবাসেন এ উপলব্ধি তাহার আজ নূতন নয়—কিন্তু জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তাহারই সুখের জন্য পিতার এ ব্যাকুলতা রমাকে অভিভূত করিয়াছিল—হায় রে—কি বস্তু সে আজ হারাইতে চলিয়াছে। যে দুর্ভেদ্য সংযমে নিজেকে ঢাকিয়া সে তাহার বাবার মা হইয়া তাঁহার মাথা কোলে করিয়া লইয়া বসিয়াছিল—সে সংযম এবার টুটিল। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পিতার বুকের উপর বাষ্পবারিসিক্ত মুখ চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ক্ষীণ দুর্ব্বল বাহুতে তাহার মাথা তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কলেরা রোগীর গায়ে এমনি ক'রে মুখ রাখতে নেই মা। আজ কতদিন পরে আমি তোর মায়ের কাছে যাচ্ছি—এখন আমায় কেঁদে বিদায় দিবি রমা? আজ তের চৌদ্দ বছর তোদের দুজনার ভাবনা ভেবে এসেছি, আজ স্বর্গে গিয়ে কেবল তোর ভাবনাটা বাকী থাক্‌বে। কাঁদিস্‌ নে—পাগলি—কাঁদিস্‌ নে।"

রমা নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

পিতার মৃত্যুর দুই দিন পরে রমা বিজয়কে পূর্ব্বোক্ত চিঠি দেয়। সে আশা করিয়াছিল পত্র পাঠ বিজয় নিশ্চয় চলিয়া আসিবে। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল—বিজয় যখন তখনও আসিল না তখন সে ভাবিল বিজয় হয়তো কলিকাতায় নাই, তাই পত্র পায় নাই। বিশেষ কাজে সে আসিতে না পারিলে অন্ততঃ একখানা চিঠিও দিত। এদিকে সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক—বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহার স্থিতি সম্বন্ধে সঠিক কিছু স্থির করা আবশ্যক। বোরকার ও রামলিঙ্গম্‌

তাহাদের বাসায় যাইয়া তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু একজন বর্ষীয়সী ঝি রাখিয়া তাঁহাদের সে প্রস্তাব সে ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ ব্যবস্থা তো আর চিরকালের জন্য হইতে পারে না—তবে পিতার শেষ স্মৃতিমণ্ডিত এ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সে দুদিনের জন্যই বা অন্যত্র যায় কেন? এ দুঃখের সময় বিজয়ের সান্নিধ্য তাহাকে কতকটা শান্তি দিতে পারিত। সে কথা ছাড়া এই সমস্ত বিষয়ে তাহার সহিত একটা পরামর্শ করিতে সে বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল—কারণ বিজয় যদি তাহাকে বিবাহ করেও, পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে রমা তো তাহাতে রাজী হইতে পারে না। এই সময়টা সে কোথায় কি করিয়া কাহার সহিত কাটাইবে? চক্রধরপুরে ঝি-চাকর লইয়া একা এক বাড়ীতে এক বৎসর কাটান তাহার সুদুঃসহ বোধ হইতেছিল—অন্য কাহারও বাড়ীতে এক বৎসর কাটানো ত' অসম্ভব। আর এক আছে অপরেশবাবুর ভরসা;—তা রমা নেহাত সর্ব্বশেষ পন্থা বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

তিন দিনের দিনও বিজয় যখন আসিল না বা তাহার পত্র আসিল না—তখন তাহার চিঠি কবে কোথায় বিজয়ের কাছে পৌছায় এবং মোটে পৌছায় কি না, এ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া রমা কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল, যে মেয়েদের বোর্ডিংযুক্ত কোনো স্কুলে সে একটা চাকুরী পায় কি না। তাহা হইলে তাহার স্থিতি-সমস্যার কতকটা সমাধান হয়—মেয়েদের লইয়া কাজকর্ম্মে থাকিলে মনটাও ব্যাপৃত থাকিবে, ঝি-চাকরের বোঝাও তাহাকে বহিতে হইবে না। ঠাকুরকে তো তুলিয়াই দিয়াছিল—কিন্তু বৈজুকে ছাড়িতে তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না—সে তাহার বাবার চিহ্ন;—তা ছাড়া বৈজুও তাহার দিদিমণিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে কল্পনায় ইহারই মধ্যে একদিন কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে।

তবে বৈজু কিছুদিনের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী যাইতে পারে—পরে চক্রধরপুরের বাড়ীর পাহারাদার হইতে পারে—রমা নিজে স্কুলের ছুটীতে ছুটীতে তো এখানেই আসিবে। আর ছুটির সময় যদি বাড়ীতে ভাড়াটিয়া থাকে—রমা ভ্রমণ-সুখে যেখানেই থাকিবে, সেও নয় ছুটির কয়দিন সেইখানেই কাটাইয়া আসিবে। এমন বিশ্বাসী লোক সহজে মেলে না।

পিতার মৃত্যুর সাত আট দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় সে হলের মধ্যে বসিয়া এম্‌নি সব সাত পাঁচ কথা ভাবিতেছিল—এমন সময় বাড়ীর দরজায় একখানি গাড়ী আসিল। রমা ঔৎসুক্যভরে লক্ষ্য করিয়া দেখিল গাড়ী হইতে নামিয়া একটি মহিলা সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছেন। পরণে তাহার লালপেড়ে শাড়ী—নেহাৎ আটপৌরে, গায়ে একটা মোটা ব্লাউজ, চুল যেমন তেমন করিয়া বাঁধা, সিঁথিতে সিঁদূর হাতে দু' দু' গাছি সোনার রুলীর উপর একখানা করিয়া সাদা শাঁখা। মহিলাটি নিকটস্থ হইলে রমার সে মুখখানি অত্যন্ত পরিচিত মনে হইতেছিল। ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সেই মহিলাটি প্রশ্ন করিলেন "আপনার নামই রমা দেবী?" বিদ্যুৎ-বরণী মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিতে গিয়া হঠাৎ রমার মনে পড়িয়া গেল—সেই যে বিজয়ের কাছে একখানা ছবি সে দেখিয়াছিল সে প্রতিকৃতি ইহারই। মনে হইবামাত্র সহস্র প্রশ্ন তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি একাকিনী কেন হঠাৎ এভাবে এখানে আসিলেন? —তবে কি বিজয় অসুস্থ?—তবে কি বিজয় কলিকাতায় নাই? তবে কি বিজয় তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং ভগ্নীকে পাঠাইয়া দিয়াছে?—না এই মেয়েটি আরেক রকম দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিতে এখানে আসিল? না তাহার প্রতি তিরস্কার—সংশয়াকুল চিত্তে সে বলিল, "আমার যদি নেহাৎ ভুল না হ'য়ে থাকে আপনি বোধ হয় বিজয়বাবুর বোন্?—

আপনাকে যে আমি চিনি।" বলিয়া মৃদু হাসিয়া মহিলাটির পানে হাত বাড়াইয়া তাহাকে সাদরে সাম্‌নের চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিল।

যেন শিহরিয়া দু' পা পিছাইয়া তরুবালা কহিল—"কি বল্লেন?—আমি বিজয়বাবুর কে?"

"কেন বোন্? আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত না হ'লেও আপনার ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি আমি অনেকদিন। কিন্তু ছবির আপনি এত রোগা ছিলেন না তো।"

নিপুণ তুলিকা স্পর্শে অভিনেত্রীর রূপে ক্লিষ্টতার ছাপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মায়—চোখের কোলের কালিটুকু পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় অস্পষ্ট আলোকে তার কারসাজি ধরা পড়িবার জো ছিল না।

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া তরুবালা কহিল, "আমি বিজয়—বিজয়বাবুর বোন্?"

তাহার ভাবে একটু বিস্মিত হইয়া রমা কহিল, "ছবিতে আপনার সাজসজ্জা অবশ্য খুব জমকালো ছিল, কিন্তু এত ভুল আমার চোখের হ'তে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপনার মুখের মত মুখ সহজে ভোলা চলে না! কিন্তু আপনি এমন কচ্ছেন কেন? বিজয়বাবু ভালো আছেন তো?"

কপালে করাঘাত করিয়া তরুবালা কহিল, "হায় রে আমার অদৃষ্ট—এই ক'রেই সে আপনাকে জড়িয়েছে। কিন্তু এর আগে আমার মরণ হোলো না কেন?—স্বামী—আমার ইহপরকালের দেবতা,—তার এ শোচনীয় অধঃপতনের আগে আমি চিতায় উঠলাম না কেন? আজ পরের কাছে আমি কি ক'রে এ লজ্জা ঢাকব?"

রমা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে শুধু বলিতে পারিল—"বিজয়—

বিজয়বাবু আপনার স্বামী?" তাহার মনে হইতেছিল, হয় তো রমণী উন্মাদ!

উত্তরে তরুবালা কাঁপিতে কাঁপিতে রমার জানু দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাতে মুখ লুকাইয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"সে লজ্জার কথা কি ক'রে আপনাকে বল্ব রমা দেবী?—কিন্তু—কিন্তু আপনার কাছে আজ আমি স্বামী-ভিক্ষা চাইতে এসেছি—আপনাকে সবই বল্‌তে আমার হবে। তিন বছর আগে—তখন আমি মুক্ত হাওয়ায় প্রজাপতির মত আপনার আনন্দে আপনি ঘুরে বেড়াতাম—তখন বিজয়বাবু হাস্যে লাস্যে ঐ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে আমার সাম্‌নে এসে আমার সর্ব্বনাশ করেন। বাবার ভয়ে শেষে আমায় বিয়ে করতেও বাধ্য হন। কিন্তু আমার ভাঙা কপাল বাবা জোড়া দেবেন কি ক'রে?—বড়লোক—দু'লাখ টাকার উপর সম্পত্তি—খেয়াল ছুটতে তাঁর বাধা কি? —আমি ঘরকরণার দাসী হলাম। তবু আমি তো আশা ছাড়তে পারি নি, তাকে একদিন আবার পাবো—আমার ভালোবাসার টানে বাইরের এসব বাঁধন একদিন ছিঁড়ে যাবে। ওঁকে একবার পেয়ে তাঁকে হারানো যে কি শক্ত তা আপনি হয়তো বুঝ্‌বেন না—" উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। রমার এতক্ষণে মনে হইতেছিল—ইহার কথাগুলি তো ঠিক পাগলের মতো শুনাইতেছে না। তবে—তবে কি··বিশ্বসংসার তাহার চক্ষে কালোয় কালোয় একাকার হইয়া গেল। সে কি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু কম্পিত ওষ্ঠে একটু অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তরুবালা একটু যেন সামলাইয়া আবার কহিতে আরম্ভ করিল—"কিন্তু এ চিঠিখানা তাঁর নেহাত সাবধানতা সত্ত্বেও আমার হাতে এসে পড়াতে বুঝতে পারছি আমার কপাল জোড়া লাগবার নয়। আপনার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্ত্তা এতদূর

এগিয়ে গেছে, অথচ—অথচ হতভাগী আমি তার বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারি নি।—আর হরি হরি—আপনি জানেন আমি তাঁর 'ভগ্নী'। এ মুখ কি ক'রে আমি মানুষের সমাজে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াই—আমার অহর্নিশি যে পোড়ানি—আপনি কি তার অংশীদার হতে এ পাপের সংসারে আসতে চান? একদিন তাকে ফিরে পাবার আমার ক্ষীণ আশাটুকুও কি আপনি কেড়ে নেবেন? আপনি হয়তো আশ্চর্য্য হচ্ছেন, ব্যভিচারী স্বামী যদি পত্ন্যন্তর গ্রহণান্তে নিয়ন্ত্রিত-চরিত্র হয় তাতে আমার এত আপত্তি কেন—কিন্তু চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের এ অছিলায় নারীজাতীর উপরে একটা কত বড় অপমান—কত বড় জুলুমের প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তা কি আপনি বুঝবেন না? আপনি তাকে বিয়ে ক'রতে রাজী হয়েছেন—কিন্তু তখন তো আপনি সব কথা জান্‌তেন না। তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এত বড় অন্যায় কি আপনি হ'তে দেবেন? আমায় ভিক্ষা দিন, ভিক্ষা দিন—আমি আশায় আশায় যে আকাশ-কুসুম রচনা করেছি তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন না"—বলিয়া সে রমার পায়ের উপর মুখ থুবড়িয়া পড়িল। এতক্ষণে রমার বুকের মধ্যে লজ্জা ঘৃণা ক্রোধের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—বিচারবোধও কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে দুই হাতে তরুবালাকে টানিয়া তুলিয়া পাশের চেয়ারটাতে বসাইয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল, "আপনার কথা যে সত্য তার প্রমাণ?"

তরু দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"প্রমাণ? প্রমাণ আমার কথায়, আমার শাঁখায়, সিন্দুরে—এই আপনার লেখা পত্রে—এই আমার আংটিতে—এই বুকের লকেটে—"

রমা একটু অপ্রস্তুত হইল। সত্যই তো একজন ভদ্রমহিলা একথা যথার্থ না হইলে এমন করিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিবে কেন? তা' ছাড়া আংটিতে বিজয়ের নাম খোদা—লকেটে বিজয়ের ফটো—তবু

অবিশ্বাস?—কিন্তু সে বিশ্বাস করে কি করিয়া—সেই দৃষ্টি, সেই ব্যাকুলতা, সেই আত্মদান—কি করিয়া তাহাতে ছলনা থাকিতে পারে?

রমা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"আপনি বলছিলেন বিজয়বাবু দু'লাখ টাকার উপর সম্পত্তির মালিক—কথাটা কি ঠিক?"

"ঠিক? আপনারা এখানে তার কথা না জান্‌তে পারেন—কিন্তু ক'লকাতায় খোলামকুচির মতো পয়সা ছড়াতে তার মতো ক'জনে পারে জানি নে। তার বাবা ৺প্রকাশ দত্ত মহাশয় যা সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন তা অনেকখানি উড়িয়ে দিলেও যা আছে তা' দুলাখ টাকার সম্পত্তির ওপরে হবে বৈ কি!—এই পয়সা—পয়সাই তো আমার কাল হোলো—এ আপদ না থাকলে হয়তো আমি তাকে হারাতাম না—" বলিয়া অঞ্চলের কোণায় আবার সে চক্ষু মুছিল।

রমার মনে পড়িল তাহার বাবা প্রকাশ দত্তকে জানিতেন—তার ছেলে বিজয় দত্তের খবরও অল্পবিস্তর জানিতেন। কিন্তু বিজয় আত্মগোপন করিয়াছে—সে এত বড় ধনী এ কথা তাহাদের নিকট গোপন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? শুদ্ধ তাহাকে ঠকাইবার জন্যই কি? তাহার উপর সে বিবাহিত! হায় ভগবান্—আকাশ হইতে একটা বাজ ফেলিয়া ইহার আগে রমাকে পুড়াইয়া মারিল না কেন? সে আগুনের জ্বালা যে ইহার কাছে চন্দনের প্রলেপ হইত!······কিন্তু সেই রুদ্ধ কণ্ঠ, বদ্ধ দৃষ্টি, সর্ব্বস্ব বিলাইয়া রিক্ত হইয়া পাইবার উগ্র আগ্রহ—এগুলি কি এতই ফাঁকি হইতে পারে—সে কি এতই বোকা—কাঁচকে সে হীরা বলিয়াই তুলিয়া লইল? মেকির ফাঁকিতে এতই মূর্খের মত গেল?······

রমাকে স্তব্ধ দেখিয়া তরুবালা কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া আবার তাহার পা ধরিতে যাইতেছিল;—এবার তাহাকে দুই হাত দিয়া বাধা দিয়া রমা কহিল, "আপনি ছেলেমানুষী করবেন না! আমাদের বিয়ে

আর হতে পারে না, একথা বলাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। আমি বড্ড শ্রান্ত বোধ কচ্ছি—এখন বিদায় নিতে চাই। ঝিকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি—আপনার যা দরকার সব কাজ করবে। আপনারা যে ট্রেণে খুসী ফিরবেন—আর যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যেতে ভুলবেন না।"

রমা অগ্রসর হইতেছিল—তরু তাহাকে হাত বাড়াইয়া বাধা দিয়া কহিল, "আমি রাত-প্যাসেঞ্জারেই ক'লকাতা ফিরব, কাজেই এক্ষুণি যেতে হচ্ছে। রাস্তায় গাড়ীতে আমার ঝি রয়েছে—আপনার কোনো কষ্ট করবার দরকার নাই—" তারপর রমার হাত দুইখানি নিজের মুঠায় তুলিয়া লইয়া কহিল—"তুমি আমায় যতই বেহায়া মনে ক'রে থাক বোন্, কিন্তু যা তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিলে এর জন্য ভগবান তোমার ভালো করবেন—আর আমি তোমার পায়ে বিকিয়ে রইলাম যদিও আমার মতো নগণ্য মেয়েমানুষের মূল্য তোমার কাছে কিছুই নয়।" বলিয়া রমাকে একবার অলিঙ্গন করিল। রমা সসঙ্কোচে নিজেকে মুক্ত করিয়া কহিল, "আপনি তাহ'লে এক্ষুণি যাচ্ছেন? আচ্ছা নমস্কার। কৃতজ্ঞ আমিও আপনার কাছে অনেকখানি—নইলে আমার পরিণামে কি হোতো ভাবতেও আমি শিউরে উঠ্‌ছি। যাক্—আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না কে জানে?—আপনার নামটা জানতে একটু কৌতূহল হ'য়ে থাকলে তা মাপ করবেন কি?" স্মিতমুখে তরু মুখ তুলিয়া কহিল, "তুমি আমার বুকের যতখানি জায়গা জুড়েছ বোন্, তাতে মাপ-টাপ ক'রবার কথা তুল্লে আমি মনে বেদনা পাই—তাছাড়া এ তো অতি তুচ্ছ কথা। আমার নাম তরুবালা।" কথাটা কহিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে একটু চমকিয়া উঠিল—সত্য নামটা বলিয়া ফেলা এক্ষেত্রে উচিত হইল কিনা! বিজয়ের সহিত সাক্ষাতে যদি সব ধরা পড়িয়া যায়। পরক্ষণেই তরুবালা আবার কহিল, "তাহলে আসি বোন্! আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরলাম। তুমি

একখানা চিঠি লিখে দিও যে তুমি সব জেনেছ—কিন্তু বুঝ্‌তেই পারছ আমার প্রসঙ্গটা তাতে না থাকাই বোধ হয় ভালো হবে।”

কথাটা শুনিয়া রমার এত দুঃখেও হাসি পাইল। সে কহিল, “হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনি সর্ব্বথা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন। আমি তাঁর সঙ্গে আর দেখা পর্য্যন্ত করব না। নমস্কার।”

তরু মানুষ চিনিত সে বুঝিল সত্যই রমা বিজয়ের সহিত আর দেখাও করিবে না। সেও রমাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তরু বাহির হইয়া গেলে রমা মুহ্যমান হইয়া সাম্‌নের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। ভগবান্‌ তাহার কপালে কি শেষে এত দুঃখই লিখিয়াছিলেন? তরুবালা নামটা শুনিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল সেইদিন পাহাড় উৎরাইতে অচেতন অবস্থায় বিজয় ‘তরুবালার’ নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। তখন সে সে-কথায় মনোযোগ দেয় নাই আজ বুঝিল তাহার মানে কি?

আর ইহাকেই কিছুদিন পূর্ব্বে রমা যাচিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। ঘৃণায় ক্ষোভে অপমানে তাহার চিত্ত জলিয়া যাইতে লাগিল। এতদিন যেমন সে আশা করিতেছিল, যদি আজ বিজয় আসে যদি আজ, যদি আজ···। এখন তার তেমনই ভয় হইতে লাগিল—যদি আজ বিজয় আসিয়া পড়ে, যদি কাল—যদি পশু´—! স্থির করিল আর চক্রধরপুরে থাকা নয়, পলাইতেই হইবে।

কিন্তু চাকরী তো জুটিল না। জুটুক বলিলেই ও জিনিষটা সহজে, জোটেও না। তাই সে এলাহাবাদে অপরেশবাবুকে তার করিয়া দিল, কালই সে এলাহাবাদে তাঁহার ওখানে রওনা হইতেছে। পিতার মৃত্যু সংবাদ সে অবশ্য পূর্ব্বেই দিয়াছিল এবং তিনিও আগ্রহ করিয়া রমাকে পূর্ব্বেই তাঁহার বাড়ীতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ইহা পর্য্যন্ত লিখিয়া-

ছিলেন, তাঁহার সাময়িক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি অবশ্য আসিতে পারিবেন না, কিন্তু রমার আসিবার সঙ্গতি না থাকিলে তিনি তাঁহার ছেলে যতীশকে পাঠাইয়া দিবেন। যতীশও সম্প্রতি রিসার্চএর কাজের জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়াছে নয়তো ইতিপূর্ব্বেই সে রওনা হইয়া আসিত।

পরদিন ভোরবেলা রমা বৈজুকে লইয়া এলাহাবাদ যাত্রার উপযোগী বাঁধা-ছাঁদার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ যতীশ আসিয়া উপস্থিত। শ্যামবর্ণ চার হাত লম্বা, আধ ময়লা খদ্দরের জামা কাপড়ে মোড়া ভদ্রলোকটী একটা ছোট ব্যাগ হাতে সোজা বাড়ীর বারান্দায় উঠিল; রমাকে সামনে পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই বোধ হয় রমা দেবী?"—তখন রমা যেমন আশ্চর্য্য তেমন বিরক্ত হইয়াছিল।—অদ্ভুত ইহার আচরণ, ভদ্রতা-জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, একটা নমস্কার পর্য্যন্ত এ করিল না! রমা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনার কি চাই?"

"আমার নাম যতীশ, এলাহাবাদের অপরেশবাবুর ওখান থেকে আস্‌ছি।"

রমার চোখে একটু বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—সে বলিল—"ওঃ"—তারপর বৈজুকে ডাকিয়া একখানা চেয়ার দিতে বলিল।

ধপ্‌ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যতীশ কহিল—"আপনি দেখ্‌চি প্যাক কচ্চেন, কোথাও যাওয়া আমি পৌছুবার আগেই স্থির ক'রে ফেলেচেন নাকি? বাবা বল্‌ছিলেন—"

কথা শেষ না হইতেই রমা বলিল—"আমি এলাহাবাদই তো আজ রওনা হব ভাবছিলুম। কাল আপনার বাবাকে তার ক'রে দিয়েছি।"

এমন সময় ঝি রমার প্রাতঃকালিক চা লইয়া আসিল। ছোট্ট টিপয়ের ওপর পেয়ালাটা যতীশের পানে ঠেলিয়া রমা শুধু বলিল—"খান—"।

"আচ্ছা, কাল রাত জেগেচি এক পেয়ালা খাওয়া যাক—শরীরটা সত্যিই একটু চাঙ্গা হয় কিনা দেখি।"

ইতোমধ্যে রমারও চা আসিল, কিন্তু তার পূর্ব্বেই সংসারে ঢালিয়া যতীশ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রমা অবাক হইয়া লোকটির ধরণধারণ দেখিতে লাগিল।

চা'য়ের পেয়ালা যতীশের অর্দ্ধেক খালি হইয়াছে এমন সময় সে দেখিল, বৈজু বারান্দার এক কোণায় একটা প্রকাণ্ড বিছানা বাঁধিবার চেষ্টায় হিমসিম খাইয়া গেল, কিছুতেই বাণ্ডিলটা আঁট হইতেছে না। পেয়ালা রাখিয়া যতীশ নিঃশব্দে যাইয়া বৈজুর সাহায্যে লাগিয়া গেল। ঢিলা হাতার জামাটায় কাজে অসুবিধা হইতেছিল। ধাঁ করিয়া সেটা খুলিয়া চেয়ারের উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যতীশ উঁচু হইয়া দড়ি কষিতে লাগিল। এবার রমা সত্যই একটু বিরক্ত বোধ করিল। তরুণী ভদ্রমহিলা সে, তাহারই সামনে হঠাৎ একজন নবাগত পুরুষ নগ্নগাত্র হইয়া গেল, তাহার অবস্থিতিতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, ইহাতে তাহার সহজ সমীহবোধ আঘাত পাইতেছিল। অন্দরের দিকে ত্রস্তে চলিয়া যাইতে যাইতে তাহার ডাক্তারী চক্ষে কিন্তু সে ঐ লোকটির সুগঠিত. অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল দেহখানির প্রশংসা না করিয়া পারিল না।: কালো পাথরে অ্যাপোলোর মূর্ত্তি কুঁদিয়া তোলা হইলে যাহা হয়, এ যেন ঠিক তাই এমনি তাহার প্রত্যেক মাংসপেশী ও সমস্ত অবয়বের সুসামঞ্জস্য।—তফাৎ শুধু এই যে লোকটির সমস্তখানি বুক চুলে ঢাকা।

রমা রান্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবিতে লাগিল—অশ্চর্য্য এই জংলী মানুষটি। এ এম্-এ পাশ করিয়াছে কেন—লেখাপড়া যে: শিখিয়াছে ইহাই বিশ্বাস হইতে চায় না। ইহারই সঙ্গে নাকি বাবা তাহার বিবাহের কল্পনা করিতেছিলেন!—বিজয়ের সঙ্গে এই লোকটির কখনো তুলনা চলে?

তারপর এই লোকটি তাহার পিতা অপরেশবাবুর ইচ্ছার কথা কি

জানে না? জানিলে কি সে তাহার সামনে একটু জড়িমা, একটু সঙ্কোচও বোধ করিত না? মহিলা সমাজে লোকটা যে মেশে নাই ইহাতো সুনিশ্চিত এবং অন্ততঃ সেইজন্যও তো রমার সমক্ষে ইহার একটু সঙ্কোচ বোধ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।—কি জানি এ কি ধরণের মানুষ!

১৯

এলাহাবাদে আসিয়া রমা দেখিল সে এক অদ্ভুত জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। বাড়ীতে একপাল লোক। তাহার উপর অতিথি আনাগোনার অন্ত নাই—বাড়ীখানা একটা হোটেল বলিলেই চলে। অপরেশবাবু ওকালতি করিয়া এলাহাবাদে নাম ও অর্থ দুই-ই যথেষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার বাড়ী হইতে অতিথি ফিরিত না। এ সব বিষয়ে তিনি যেমন পুরাতন ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন, অনেক বিষয়ে তিনি আবার বর্ত্তমান প্রগতির সঙ্গে তাল দিয়া চলিতেন। পর্দ্দা বাড়ীতে নাই বলিলেই হয়; চৌদ্দ বছরের মেয়ে তাঁর—লীলা নবম শ্রেণীতে জগৎতারিণী স্কুলে পড়ে। ছেলে বড়টি বিলাত ফেরত সতীশ—ব্যারিষ্টার, বাপ প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহার স্থানে জাঁকিয়া বসিয়াছে—দ্বিতীয় যতীশ, অপরটি রতীশ। বাইশ বছরের একহারা ছোক্‌রা রতীশ, বি-এ পরীক্ষায় দুইবার ফেল করিয়া হঠাৎ তাহার খেয়াল হয় ব্যবসা করিবে। ইতিমধ্যেই কয়লায় হাজার তিনেক টাকা লোকসান দিয়া সম্প্রতি কাপড় ধরিয়াছে। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় এবার প্রথমেই বড় দোকান ফাঁদিয়া বসে নাই; একটা কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরি করিয়া ঘোরে। এত বড়লোক বাপের ছেলে—লোকে ঠাট্টা করে—সে কান দেয় না। বাপ-ও মনে মনে

আশীর্ব্বাদ করেন, উৎসাহ্ দেন, কিন্তু ছেলেকে রোদে পুড়িতে ও জলে ভিজিতে দেখিয়া একদিনের তরেও বলে না 'একখানা টাঙ্গা নিয়ে ফিরি কর'। সতীশ কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিত 'ছোঃ'! অপরেশবাবু বিপত্নীক—সুতরাং সতীশের স্ত্রী নীরজাই সংসারের গৃহিণী। নীরজা পঞ্চবিংশ-বর্ষীয়া যুবতী—সুন্দরী সুশিক্ষিতা!—গৃহকর্ম্মকুশলা। স্বামীর মত সাহেবিয়ানা নাই, তবে তাঁহার সঙ্গে পা ফেলিয়া না চলিয়াও তো উপায় নাই।

ইহা ছাড়া মামার শালা পিসের ভাই প্রমুখ বেকার দল এবং জ্ঞাতিসম্পর্কীয়া নিঃসহায়া খুড়ী পিসি মাসীর দলও বাড়ীতে কম ছিল না—এ হেন বাড়ীতে ডিনারপার্টি হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন লক্ষ্মীপূজা সবই চলিত। অপরেশ জীবিত থাকিতে সতীশ ইচ্ছা করিলেও এর কোনোটাতে বাধা দিতে সাহস পাইতেন না, অবশ্য তাঁহার সাহেবিয়ানাতেও অপরেশ বাধা দিতেন না। সবার ছোটটি বলিয়া লীলা বাপের আদরের মেয়ে—সে বলে—"বড়দা' সাহেবিয়ানা করে যে কি সুখ পান জানি নে, দারুণ গরমে পাৎলা জামাটা পর্য্যন্ত গায়ে রাখতে ইচ্ছে হয় না—উনি দিনরাত হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট, পরেই আছেন।" অপরেশবাবু জবাব দেন, "সবারই প্রবৃত্তি এক হয় না মা, সবার সাফল্য ও সার্থকতার পথও এক নয় মা, ও সাহেবিয়ানাই যদি পছন্দ করে তো করুক।"

আবার রতীশের সম্বন্ধে সতীশ যখন বলেন, "ওর কিচ্ছু হবে না—ব্যবসা কর্ব্বেন—না, শুধু পয়সা উড়ুবেন।" অপরেশবাবু বলেন, "ওড়াক না বাবা দু'চার পয়সা, ও বদ্‌খেয়ালে তো ওড়াচ্চে না আর। সবাই যে ব্যারিষ্টার হবে, না তো M. A. পাশ করবে—তার মানে কি আছে?"

এম্‌নি ইহাদের সংসার। ইহার মধ্যে আসিয়া রমা ফাঁপরে পড়িল।

তাহার উপর অপরেশবাবু কিছুতেই তাহাকে চাকুরী করিতে দিবেন না —বলিলেন, "আমার নতুন মা'টিকে কি চাকরী করতে পাঠাতে পারি? ছেলে ম'রে গেলে কোরো তো কোরো। তবে মা, পড়তে যদি চাও কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে যাও"। অগত্যা সে লীলার সঙ্গে এক গাড়ীতেই কলেজ যাতায়াত করিতে লাগিল।

অপরেশ তাহাকে পুত্রবধূ করিবেন এ আকাঙ্ক্ষা বা আশায় পাছে বা তাহাকে খাটিয়া খাইতে দিতে গররাজী হইয়া থাকেন—এ আশঙ্কা সে প্রথমটাতে করিযাছিল; কিন্তু এ ভয দূর হইতে তাহার বেশী দিন গেল না। কেননা অপরেশবাবু আকারে ইঙ্গিতে ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ তো করিলেনই না, তাঁহার পুত্র যতীশও সেই যে পাঁচ ছয় মাস হইল তাহাকে লইয়া আসিয়াছে তাহাব পর আর তাহার সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা হইয়াছে বোধ হয় আঙুলে গুণিয়া শেষ করা যায়। আর সে কথা কহিবেই বা কি? পি-আর-এস-এর থিসিস্‌ শেষ হইয়াছে, তাহার এইবার ঘুরিয়া বেড়াইবার 'বাই' ধরিয়াছে। আজ কানপুর, কাল পাটনা, পর্শু লক্ষ্ণৌ—এম্‌নি করিয়া সে নিযত চঙ্‌ক্রমনে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে এলাহাবাদে আসে। সে সময যে কয দিন থাকে নিজের ঘরখানিতে মৌরসী পাট্টা গড়িয়া বসে—এমন কি সতীশের ড্রইং-রুমে যখন পার্টি বসে বা গান জমে, তখন সে তরুণ তরুণী অভ্যাগতদের সে আসরে একবার মাত্র পদার্পণ করিয়াও তাহার কৌতূহল প্রকাশ করে না। মধ্যে মধ্যে তাহার বদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতর হইতে একটা আধাভাঙা সেতারের বুকে— কখনো বেদনা কখনো আনন্দের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া ঘরের বাহিরে তাহার রেশ পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র। সঙ্গীতজ্ঞ রমা বুঝিত এই অদ্ভুত লোকটি আর কিছু জানুক না জানুক সেতারে একেবারে সিদ্ধহস্ত।

কাজের লোক সতীশ এই অকেজো ভাইটিকেও মানুষ করিয়া তুলিবার

জন্য বিলাত পাঠাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন দেরাদূন যাত্রা-মুখে সে অপরেশ, লীলা, রমা, সতীশ, রতীশ—সবার সামনে বলিয়া গেল, "বিলেত ফিলেত আমি যাবো না। অপরেশবাবু মাথার টাকে হাত বুলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, সতীশ ভাইয়ের রকম দেখিয়া রাগিয়া কাঁই হইল, রতীশ ও লীলা উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়িল, রমা অপরেশবাবুর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ভাবিতেছিল—কত কম কথা কয় এই লোকটি, অথচ যেটুকু বলে তাহাতে যে আর অন্যথা হইবার জো নাই তাহা স্বরের প্রত্যেকটি ধ্বনিতে টের পাওয়া যায়।

ইহার মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের এক অধ্যাপকের পদ খালি হইতে সতীশ এইবার বাপের কাছে গিয়া বলিল, "যতীশকে ব'লে দেখুন, এ চাক্‌রীটার জন্য যদি চেষ্টা করে। পি-আর-এস পেয়েচে, হ'য়েও যেতে পারে। Dean of the faculty of Science আমার বিশেষ বন্ধু—তাঁকে আমি বল্লে chance-ও বেশ আছে।"

সেদিন যতীশ মাসেক পরে দেরাদূন হইতে ফিরিয়াছে। অপরেশ তাহাকে ডাকিয়া আরম্ভ করিলেন, "সতীশ বল্‌ছিল—" সব শুনিয়া মাথা নীচু করিয়া যতীশ বলিল, "আমায় চাকরী করতে বলবেন না।"

পার্শ্বোপবিষ্টা রমাকে উদ্দেশ করিয়া অপরেশ কহিলেন, "ফ্যানটা খুলে দাও তো মা—বেশ। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলে। চাক্‌রী না করতে চাও তো কি ক'রবে? একটা কিছু তো করতেই হবে?"

যতীশ পূর্ব্ববৎ কহিল "সেটা এখনো ভালো ক'রে ভেবে দেখিনি, যা হয় একটা কিছু করা যাবে।"

"যাই কর একটা তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে ফেলাই কি উচিত নয়? সংসারী লোকে এ বয়সে যথাসাধ্য উপার্জ্জনের চেষ্টাই করে। অবশ্য তুমি সংসারী হও নি, কিন্তু হবে তো একদিন।"

যতীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি যদি সংসারী না-ই হই, তাতেই বা ক্ষতি কি? আমার বিয়েতে ইচ্ছা নেই!"

এসব প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিয়া রমার ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া যায় কিন্তু যে বইখানা সে অপরেশকে পড়িয়া শুনাইতেছিল তাহা একটা মধ্য পরিচ্ছেদে আসিয়া থামিয়াছে—সেটা শেষ না করিয়া উঠিয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা ইতস্তত করিয়া সে বলিল, "এখন বইটা কি থাকবে জ্যেঠামশাই?"

অপরেশ কহিলেন, "বই থাক। কিন্তু বোসো।—হ্যাঁ তোমার বিবাহে অনিচ্ছা। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে একথা যখন একবার উঠেছিল তখন তো অনিচ্ছা প্রকাশ করনি।"

রমা ঘামিয়া উঠিতেছিল যে পাছে তাহার কথা এ প্রসঙ্গে উঠিয়া পড়ে! সেই কারণেই বৃদ্ধ তাহাকে বসিতে বলিলেন কি? তাহাও তো সম্ভব নয়, তাহার জ্যেঠামশাই এত অবিবেচক হইতে পারেন না। কিন্তু রমার অন্তর-কোণে এ কুণ্ঠার মধ্যেও একটা কৌতূহল উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল যে এই ক্ষ্যাপাটে লোকটি বাপের কাছে কি বলতে চায়?

যতীশ বলিল—"তখন ভেবেছিলুম বে' করব, এখন নানা কারণে ইচ্ছা নেই।"

"আবার তো ইচ্ছা হ'তেও পারে, সেইজন্যও উপার্জ্জনে অন্ততঃ একেবারে নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নয় বোধ হয়।"

"সে হয়, তখন দেখা যাবে; এত ভবিষ্যৎ ভেবে কি কায করতে সবাই পারে?—আমি অন্ততঃ পারিনে।"

কিছুক্ষণ সস্নেহে পুত্রের পানে তাকাইয়া থাকিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া অপরেশ কহিলেন, "আচ্ছা এখন যাও, এ সম্বন্ধে আরো একটু ভালো করে ভেবে দেখো।"

যতীশ চলিয়া গেলে রমাকে লক্ষ্য করিয়া অপরেশ কহিলেন—"জানো মা এই যতীশটা একবারে পাগল। তুমি হয় তো কিছু কিছু জানো, তোমায় ওকে দিয়ে একান্ত আপনার করে নেবার আমার ইচ্ছা ছিল। সেই জন্যই ওকে ওর **M. A.** পরীক্ষার পর তোমার বাবার পরামর্শে চক্রধরপুর পাঠাবো ভেবেছিলুম। ও অম্‌নি ক্ষ্যাপা ব'লে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা ওকে অবশ্য বলিনি। কিন্তু তখন ও **P. R. S.**এর কথা নিয়ে এত মেতে গেল যে বল্লে, ক'লকাতা ছেড়ে ও কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু যাক—লোকে ভাবে এক, হয় আর। ব'লে যে বে' করবে না"—পরে একটু থামিয়া জানালা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া অস্ফুটে বলিলেন, "কি যে করবে ও, কে জানে।"

একটু পরে ফের রমাকে বলিলেন—"পড় মা পড়—**Chapter**টা শেষ করেই রেখে দে। কিন্তু যাই হোক, এক পক্ষে ভালই হোলো—ওর হাতে পড়লে তোর দুর্গতি হোতো। কিন্তু মা—তোর বাবা স্বর্গে, এখন আর আমার লজ্জা ক'রলে চলবে না। সুরেশ লিখেছিল অন্য কোথাও তোর বে'র কি একটু সূত্রপাত হয়েছিল—তারা কি সে মরে' যাওয়ার পর কোনো খোঁজখবর নিয়েছিল? শিব ছাড়া উমাকে তো আর বেশী দিন রাখা উচিত নয়।"

রমা কহিল, "না জ্যেঠামশাই, আপনার সামনে লজ্জা! সে কোথায় কি কথা উঠেছিল বটে—কিন্তু তা তখনই বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আপনিও যে বাবার মত আমায় তাড়াতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তা হ'লে কলেজেই বা যাচ্ছি কেন?—লেখাপড়াটা শেষ ক'রে তো নি—"

অপরেশ হাসিয়া কহিলেন—"বেশ খুব ক'ষে লেখাপড়া কর। এবার সুরু কর দেখি বইটা।"

২০

কালের চাকা ঘুরিয়া চলে। ক্রমে দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বৎসর। থাকিয়া থাকিয়া এ বাড়ীর কল-কোলাহলের আবহাওয়া রমার সহিয়া গেল। সে মাসী-পিসিদের দলে মিশিয়া কখন ব্রতকথাও শোনে, আবার সতীশের পার্টিরও সম্মান রক্ষা করে। কিন্তু সতীশ-নীরজার পার্টিগুলাকে অবলম্বন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি ছেলের যে স্তবগুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রমাকে প্রথমটাতে পীড়া দিত। চক্রধরপুরে যে কাজের ক্ষেত্র সে পাইয়াছিল এখানে তাহা নাই; পরের বাড়ীতে থাকিয়া সে রকম ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লওয়াও এখানে মুস্কিল, বিশেষতঃ কলেজের নিয়মিত পড়া আছে। কাজেই চিত্ত-বৃত্তির অন্য কোনদিকে প্রসারণ সম্ভব না হওয়াতে ক্রমশঃ ঐ সব স্তবগুঞ্জন তাহাকে যে শুধু আর পীড়া দিত না তাহাই নহে, একটা ক্ষীণ আত্মপ্রসাদও ক্রমে সৃষ্টি করিত। কিন্তু কোন ছেলেকেই বিন্দুমাত্র সে আশ্‌কারা দেয় নাই, বিজয়ের স্মৃতি তাহার অন্তর ছাইয়া আছে। সে যে অত বড় অপদার্থ, তবু সে তাহাকে ভুলিতে পারে না; এ হেন অপমানিত হইয়াও বুঝি ভুলিতে চায়ও না।

কিন্তু নিরন্তর এই স্তুতি-বাণী শুনিয়া শুনিয়া রমা নিজের অজ্ঞাতসারে কখন নিজের অন্তর-বাহিরের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেকটা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে বুঝিতেছিল সে পুরুষের কাম্য—আদরের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কিন্তু এই বাড়ীকে ঐ যে একটি পাগ্‌লা রাসায়নিক পণ্ডিত তাহার অস্তিত্বটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চায় না, ইহাতে সে যেমন বোধ করিত বিস্ময়, তেমন বোধ করিত অপমান। এই দুইটা বস্তুর কোনটাই

অবশ্য সে মানিতে চাহিত না কিন্তু অস্বীকার করিলেই তো আর সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না।

ইহার মধ্যে যতীশ আর একটা ভাল চাকুরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সতীশ চটিয়া নীরজাকে বলিতেছিলেন, "**Jati is becoming a parasite on the family** "—এমন সময়ে গয়া হইতে সদ্য-প্রত্যাগত যতীশ ব্যাগ হাতে—"বৌদি—" হাঁকিয়া সে ঘরে ঢুকিল। দাদার মন্তব্যটা তাহার কানে গিয়াছিল। সে ঈষৎ হাসিয়া হাতের ব্যাগটা খুলিয়া দশখানা দশ-টাকার নোট নীরজার পানে বাড়াইয়া দিয়া কহিল—নাও বৌদি—বিশ টাকা হিসাবে আমার পাঁচ মাসের খোরাক তোমায় দিলুম—এর মধ্যে আর '**parasite**' বল্‌তে পারবে না। নাও গুণে নাও।"

নীরজা হাসিয়া ফেলিযা স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল, "যেমন দাদা তেমন ভাইটি, কেমন জবাব পেয়েচ ?"

সতীশ সহসা একথার উত্তরে ওয়াল-ক্লকটার পানে তাকাইয়া যেন চম্‌কিয়া বলিয়া উঠিলেন, "**By Jove**—দশটা বেজে গেছে—কোর্টে আবার আজ—" সঙ্গে সঙ্গে কামরা হইতে অন্তর্ধান।

কি একটা কাজে রমা সে সময় ওঘরে আসিয়া দেখিল, বৌদি ও সতীশে বচসা হইতেছে ঐ একশোটা টাকা লইয়া। বৌদিও কিছুতেই লইবে না, যতীশও কিছুতেই ছাড়িবে না। অবশেষে নীরজা কহিল, "আচ্ছা এ টাকা তোলা রৈল, তোমার বৌকে একদিন গয়না গড়িয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু হঠাৎ একমাসের মধ্যে এ টাকা পেলে কোথায় ?"

যতীশ হাসিয়া কহিল—"চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি, যে কোনো রকমেই হোক রোজগারই করেচি—এ তো বিশ্বাস করবে। বাস্‌ তা' হলেই হল।"

সেদিন কি মনে করিয়া রমা বৈকালে এক পেয়ালা চা ও একটু মিষ্টি লইয়া নিজেই যতীশের ঘরে ঢুকিল। অন্যদিন লীলাকে দিয়া সে চা পাঠাইয়া দেয়—কেননা যতীশ দলে ভিড়িয়া চা'য়ের আসর জমায় না। সেদিন লীলা কাছে ছিল না বলিয়া ডাকাডাকির পর্ব্ব এড়াইবার জন্য রমাই অগ্রসর হইয়া গেল।

যতীশ কি লিখিতেছিল; তাহার পানে চোখ তুলিয়া বলিল—"আপনি যে!—চা?—আচ্ছা রাখুন।" টেবিলের উপর হইতে কাগজের রাশ সরাইয়া সে এক কোণায় একটু জায়গা করিয়া দিল।

"লীলাকে কাছে পেলুম না। কিন্তু বিকেল বেলা ঘরের মধ্যে বন্ধ হ'য়ে ব'সে ব'সে কি সব লিখে যাচ্ছেন বলুন তো—ধন্য মানুষ আপনি।"

"হুঁ—" বলিয়া এক চুমুক চা খাইয়া সে পুনরায় লেখায় মন দিল। রমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখ পড়িল টেবিলের উপর একখানা খোলা চেক্-এর উপর। কোন অর্থনীতি-পত্রিকার সম্পাদক যতীশ রায়ের নামে দুই পাউণ্ডের চেক পাঠাইয়াছে। যতীশের টাকা যে কোথা হইতে আসে তাহা বুঝিতে রমার বাকী রহিল না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ যতীশ একবার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া রমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল—"কোনো কায আছে কি?"

"নাঃ"—বলিয়া রমা বাহির হইয়া একটু মুচকি হাসিয়া ভাবিল—কাজ ভিন্ন এ লোকটির আর কোন কথা নাই।

ইহার দিন পনের পরে বৈজ্ঞানিকটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। সেদিন রমা দরজা ভেজাইয়া একা এস্রাজটা বাজাইতেছিল। বাড়ীশুদ্ধ কেহ নাই—কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছে—কেবল অপরেশ তাঁহার ঘরে দুপুর বেলা ঘুমাইতেছেন। এমন সময় চট্‌পট্ শব্দ করিয়া যতীশ তালা খুলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল। বাহির হইবার সময় সে সর্ব্বদা ঘরে তালা দিয়া যাইত।

যতীশের আওয়াজ শুনিয়া একবার রমা ভাবিল বাজনা বন্ধ করে, আবার ভাবিল—কেন ?—এতদিন পরে নিরালা বাড়ীতে আজ যদি একটু সুযোগ মিলিয়াছে তো সে তাহা ছাড়ে কেন ? তা ছাড়', যতীশ নিজে গুণী লোক, যদি সে কান পাতিয়া তাহার বাজ্‌নার মনে মনে একটু তারিফ করে—এ কল্পনাটাও বিশ্রী লাগিল না। এস্রাজের তারে মল্লারের সুর কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সে যন্ত্রটা ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া তাহার টেবিলটা গোছাইতেছে, এমন সময় ভেজানো দরজার বাহির হইবে যতীশ কহিল, "আমি একটু আসতে পারি কি ?"

আজ চৌদ্দ মাস হইল রমা এ বাড়ীতে আসিয়াছে, কিন্তু যতীশ এক-দিনের তরে তাহার সঙ্গে যাচিয়া কথা কহে নাই—আজ এই প্রথম। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া রমা ঘরের দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া বলিল, "আসুন।"

রমার কক্ষে চেয়ার ছিল না। তক্তপোষের অল্প দূরেই একটা টেবিল। একটা মাদুর বিছাইয়া রমা কাজকর্ম্ম করিত। সুতরাং সে নিজে দাঁড়াইয়া তক্তপোষটার পানে ঘাড় কাৎ করিয়া বলিল, 'বসুন।'

যতীশ একটু ইতস্তত করিয়া বসিল না। টেবিলের উপরের একখানা বই নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আপনার বাজনায় কিন্তু চমৎকার হাত, কিন্তু কৈ এর আগে তো কখন শুনি নি।"

রমার সুগৌর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া যতীশই ফের বলিল—"কিন্তু যাক্‌, সেজন্য আমি আসি নি। আমি—আমি এসেচি আর একটা কথা বল্‌তে।"

রমা প্রশ্ন করিল—"কি ?"

"কাল লীলার কাছে শুন্‌লাম বাবা কিনা—ইয়ে—আমার বে' দেবার

জল্পনা কচ্চেন এবং তাও—" হাসির চেষ্টায় একটা উচ্চ আওয়াজ করিয়া —"দুনিয়ার আর কেউ নয়—আপনার সঙ্গে। আমাকে আপনার কখনই পছন্দ হতে পারে না তা জানি, কিন্তু লজ্জায় মুখটি বন্ধ ক'রে থেকে হয়তো আপনি আপত্তি নাও করতে পারেন এই ভয়ে কাল থেকে ভেবে ভেবে আপনাকে বলতে এলাম—এমনি ক'রে লজ্জার খাতিরে নিজের সর্ব্বনাশ করবেন না। বাবাকে স্পষ্ট বলবেন আমায় বে' করা আপনার পোষাবে না।"

বলিয়া বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ রমাকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া যতীশ বাহির হইয়া গেল। লীলার কাছে এ খবর পাইয়া অবধি মূর্খ-পণ্ডিতটি অনেক ভাবিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই—বিবাহ সে করিবে না; কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা তাহার তরফ হইতে আসার চাইতে রমার তরফ হইতে আসাই ভাল;—কেননা সে প্রত্যাখ্যান করিলে পিতার অসন্তুষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও রমাও কতকটা অপমানিত ও অবজ্ঞাত বোধ করিতে পারে। তাহা ছাড়া ইহা সে এক প্রকার স্থির ঠাওরাইয়া লইয়াছিল, রমার মত অপরূপ সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে তাহার মত অদ্ভুত লোককে কিছুতেই পছন্দ করিতে পারে না। সুতরাং একথা গিয়া তাহাকে বলিবে ইত্যাদি। কিন্তু এক তরফ বিচার করিতে গিয়া এতবড় পণ্ডিত-বৈজ্ঞানিক একবার ভাবিয়া দেখিল না যে একথা যদি সত্যই উঠে, আশ্রিতা মেয়েমানুষ হইয়া তাহার জ্যেঠামশাইএর একান্ত কামনাকে এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করা রমার পক্ষে কিরূপ শক্ত হইতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে ফিরিয়া লীলা রমাকে লইয়া পড়িল। সেদিন রবিবার, পরদিনও কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল।

লীলা কহিল, "ভাই রমা-দি, তোমায় একটা কথা আর না বলে পাচ্চিনে, মেজদা'র সঙ্গে যে তোমার বে' হবে।"

রমা ভ্রূ কুঁচকাইয়া রাগের ভাণ করিয়া কহিল—"কি হবে?"

"বে' গো—বে'—উদ্বাহ—উদ্বন্ধন! তা সত্যি মেজ্‌দা যে পাগ্‌লা, ওর সঙ্গে বে' উদ্বন্ধনের সামিল বৈ কি!"

"যা' তা' বোকোনা লীলা—"

"সত্যি ভাই, বাবা কাল আমায় বল্লেন—'আচ্ছা লীলা, যতীশের সঙ্গে রমার বে' হলে বেশ হয় না? ওর মত উড়ো ছেলের মন বাঁধতে হ'লে রমার মত মেয়ে চাই। তুই এ সম্বন্ধে যতীশের মত জানতে পারিস্‌ লিলি —কোনো পাকে চক্করে? তোর মা আজ থাকলে সে-ই এ কাজ ক'রত, তা তোরও তো প্রায় সতের বয়েস হোলো—দেখিস্‌ না একবার তোর দাদাকে এ কথার আঁচ দিয়ে।' তারপরে আরো বল্লেন—'রমার সঙ্গে এ নিয়ে কিন্তু এখনি ইয়ার্কি কত্তে যাস্‌নে।' কিন্তু ভাই, কাল থেকে আমি আই-ঢাই কচ্চি, তোমায় একথা না ব'লে কিছুতে পাল্লুম না।"

রমা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আসল কথা হচ্চে এই যে তিনি আমায় ভালোবাসেন ব'লে একান্ত আপনার ক'রে রাখতে চান। কিন্তু আমার কথা উঠ্‌লে তাঁকে বোলো যে এ বিয়ে কখনোই—না থাক্‌ কিচ্ছু বলবার দরকার নেই, তিনি আপনিই সব বুঝে নেবেন ক্রমে।"

"কখনোই মানে কখনোই হতে পারে না ত? কেন রমা দি? এবার তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া ক'রব আমার ভাইকে অপছন্দ করা? কেন—অত বড় বিদ্বান্‌—অমন সুন্দর চেহারা—তা হোলোই বা কালো?—অমন—

"থাম থাম লিলি—অস্বীকার কচ্চে কে তোমার দাদা রূপে কার্ত্তিক বিদ্যায় গণেশ, কিন্তু তাই ব'লেই তাকে বে' কত্তে হবে বা তিনিই বে' করতে চাইবেন তার মানে কি আছে?"

লীলা এবার হাসিয়া গড়াইয়া কহিল, "ও—তাই কারণ, মানে—শেষেরটাই হচ্ছে আসল কারণ? তা তোমায় দিচ্ছি রমা-দি, কাল একথা পাড়তেই মেজ্‌দা প্রথমটাতে যেন কানই দিলেন না, তারপরে যেমন

তেড়ে মারতে এলেন তাতে আমার আর সন্দেহ নেই তাঁর ভেতরে ভেতরে লোভ হয়েচে—মুখ ফুটে বলতেই লজ্জা। ওসব indifference-এর ভাণ এর মানে আমি বুঝি!—"

রমাও এবার হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—"তা আর বুঝবে না কেন?—বিনয় তোমায় যে ডেঁপো ক'রে তুলেচে!"—তারপর একটু রাগতস্বরে ফের বলিল, "কিন্তু লিলি, যা বোঝ না, তা বোঝ মনে ক'রে এত বড়াই কোরো না।"

বিনয় এলাহাবাদের এক ব্যারিষ্টারের ছেলে—বাইশ বছর বয়েস, এম্‌-এ পড়ে, সতীশের পার্টিতে যাতায়াত করে এবং লীলার সঙ্গে প্রেম করে। বিবাহের পাত্র ও চরিত্র হিসাবে ছেলেটি মন্দ নয়। এখনো ব্রীফলেস্‌ ব্যারিষ্টার হ'লেও পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে। ভবিষ্যৎ আছে।

লীলা ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, নাঃ, "বুঝিনা কিসের? আমার বয়েস সতের বছর হোলো জান—বাবা বলেচেন—"

রমা মিটিমিটি হাসিয়া শুধাইল—"বিনয়ের অর্থহীনভাবে ভরা ভাষা শুনে তুই বুঝি খুব indifference দেখাস্‌?"

"যাঃ—ও"—বলিল লীলা এবার ছুটিয়া পালাইল। রমা পিছন হইতে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল— "কেমন, আমার পিছনে আর লাগতে আসবো?"

লীলা চলিয়া গেল সামনের আর্শিটাতে রমার দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল! বক্ষের অঞ্চল অসংবৃত, আঁটসাট জামা ভেদ করিয়া সর্ব্বাঙ্গের যৌবন যেন উছলিয়া পড়িতেছে। দেহ তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল। বাইশ বছর ধরিয়া বসন্ত তাহার দেহমনের দুয়ার গোড়ায় আনাগোনা করিয়াছে—'কিন্তু চক্রধরপুরের শেষ কয়টি মাস ছাড়া—সে যেন অস্ফুট পদসঞ্চারে। তারপর আসিল ব্যথা—সে নিদারুণ বেদনায়

কতদিন তো দেহের পানে তাকাইবার ফুরসৎ ছিল না। সমস্ত পুরুষ জাতি তাহার কাছে হইয়া উঠিয়াছিল যেন ধূর্ত্ততার প্রতীক! কিন্তু কালের মোহময় প্রক্ষেপ সে বেদনায় তীব্রতা হরিয়া লইয়াছে। আজ আবার যৌবন তার দাবী জানাইতে চায়। কিন্তু কি সে দাবী ?—তা সে নিজেই কি জানে ?—কেউ যে রহস্যের মর্ম্ম জানিল না সে-ই বা জানিবে কি করিয়া ? রমা অস্ফুটে আবৃত্তি করিল—

"আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কি দেয় তাতে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোক আর ভূলোকে।
কি কথা ওঠে মর্ম্মরিয়া বকুল তরু পল্লবে
ভ্রমর ওঠে গুঞ্জরিয়া কি ভাষা
ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে
নির্ঝরিণী বহিছে কোন পিপাসা—"

অজানিত একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষের অন্তস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিল। মনে পড়িল বিজয়ের কথা। কত তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা—এখন মনে করিলে লজ্জাবোধ হয়—এমন কি অপমানও বোধ হয়—কিন্তু অপমান ভুলিযা তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্য যে চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠে নাই তাহা নহে। হৌক না বিজয় বিবাহিত, তবু তাহারই জন্য তো প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া সংসার সমাজের গঞ্জনা মাথায় লইতে অগ্রসর হইয়া সে আসিয়াছিল। এই দুর্নিবার সাহস—হৌক না তাহা দুঃসাহস—ইহাই কি তাহার প্রেমের একটা পরিচয়ও নয়? নিজের বিবাহের কথা রমাকে বিজয় লুকাইয়াছে, কিন্তু রমার প্রত্যাখ্যান পাইবার আশঙ্কাই কি এ লুকানোর কারণ নয়? বিজয় রমাকে

ভালোবাসিত, থাক্ না তাহার চরিত্রে হাজার দুর্ব্বলতা—তবু সে ভালো তো বাসিত। থাক্, বিজয়ের স্মৃতি তাহার মনে অক্ষয় হইয়া থাক্।

কিন্তু আজ আঠার মাস পরে মর্ম্মরের মত শুভ্র অথচ কঠিন এই নির্লিপ্ত লোকটির পাশে বিজয়ের ছবি ভাসিয়া উঠিলে বিজয়ের জন্য হয় করুণা, যতীশের জন্য হয় শ্রদ্ধা। অজানিতে প্রেম যে কখন গিয়া করুণায় পর্য্যবসিত হইয়াছে সে জানে না। অথচ চিত্ত তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। সে যে মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত "**Love is not love which alters when its alteration find.**"—অন্তরের এ অসম্ভব পরিবর্ত্তন সে আজ অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবে কি করিয়া ?···তা ছাড়া কোন পুরুষমানুষকে রমা আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিল !—সেও এক আশ্চর্য্য ! কিন্তু বিরাট্ বীর্য্যবান্ নিরাসক্ত পুরুষকে বন্দী করিবার জন্যই যে প্রকৃতির চিরন্তন প্রয়াস—সৃষ্টির এ গোপন কথা বেচারী রমার জানা ছিল না। তাই সে বুঝিত না, কেন যতীশের কঠোরতা, ছন্নছাড়া ভাব—এমন কি অবহেলাও তাহাকে এমন করিয়া টানে।

ইহার মধ্যে রায় পরিবারের হঠাৎ এক বিপৎপাত হইয়া গেল। একদিন বাড়ী ঘেরাও করিয়া পুলিশে যতীশ রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদ্রোহিতার আসামী করিয়া চালান দিল। মামলায় সতীশ ও আরো চার পাঁচ জন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষে লড়িয়া কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। যতীশের পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইয়া গেল। পুলিশ তাহার ঘরে অনেক চিঠি ও কাগজপত্র পাইয়াছিল; আর তাহার ঘরে পাওয়া যায় একটা revolver ও কিছু কার্ত্তুজ। ইহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা ফলিল।

যতীশ পুলিশের হেফাজতে কারাভোগ করিতে হাজারিবাগ জেলে যখন আসিয়া পৌছিল তখন বেলা দুইটা। যথারীতি তাহার ওজন লওয়া হইলে একজন পাহারাওয়ালা তাহাকে ত্রিশ নম্বর কামরায় রাখিয়া আসিল। তখনও তাহার কোন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। একলা ঘরে বসিয়া এলোমেলো ভাবিতে ভাবিতে সবে তাহার চোখে ঢুলুনি আসিয়াছে এমন সময় জন ত্রিশেক কয়েদী সেদিনকার মতো কাজ হইতে ছুটি পাইয়া পিল্ পিল্ করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহারাও সেই প্রকাণ্ড ঘরখানিতে বাস করে। নূতন মানুষ দেখিয়া সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ছয় ফুট লম্বা বিরাটকায় একটা কালো লোক তার উঁচু দাঁতের সার বিকশিত করিয়া আগুয়ান হইয়া আসিল ও যতীশের কাঁধে পরমাত্মীয়ের মতো ডান হাতখানা রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"বাবু সায়েবের নাম কি ?"

অবাক হইয়া যতীশ জবাব দিল,—"শ্রীযতীশ চন্দ্র—"

"দুত্তোর 'ছিরি'র নিকুচি করেচে। এখানে আবার ছিরি ফিরি কি—সব বিশ্রী। তার পর বাছাধন—চুরি ?"

মূঢ়ের মতো যতীশ কেবল মাথা নাড়িতে পারিত—যে সে তাহা করে নাই।

"তবে ডাকাতি ?" পুনরায় যতীশ শিরঃ-সঞ্চালন করিল।

"তবে খুন, মেয়েমানুষ, জালিয়াতি, রাহাজানি—কি তবে ?"

তৎক্ষণে যতীশ একটু সামলাইয়া লইয়াছিল, আস্তে বলিল—"স্বদেশী—"

মুখের কথা কাড়িয়া লোকটা বলিয়া উঠিল "ও—ভদ্দরলোক ডাকাত"—

এবং চোখে মুখে একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটাইয়া ট্যাঁক হইতে একটা তোবড়ানো বিড়ি সোজা করিতে করিতে যতীশের পানে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "বেশ বেশ, মশা'ইর শুভাগমন হোক এবং তামাক ইচ্ছে করুন।"

"যাঃ—উনি বা বুলোক, তোর বিড়ি উনি খাবেন না জগা," বলিয়া একটা বেঁটে কোঠর-গত চক্ষু মোটা লোক বিড়িটাকে তাহার হাত হইতে থাবা মারিয়া আত্মসাৎ করিল ও সেটাকে দাঁতে চাপিয়া ট্যাক হইতে দেশলাই বাহির করিল।

"দেখ্‌লি শালা মাট্‌রুর কাণ্ডটা—কোথায় আমি নতুন মানুষের সঙ্গে খাতির কচ্চি আর ওর তামাসাটা দেখ্‌লি!"—বলিয়া জগা মাটুরকে গাল দিল।

মাট্‌রু ততক্ষণে বিড়ি ধরাইয়াছে। একগাল ধোযা ছাড়িয়া বলিল—"কেন রে বাবা—এত কেন বাবুটিকে মনে ধরেচে বুঝি।"—বলিয়া এক চোখ মুদিয়া ও আর একচোখে অশ্লীল কটাক্ষ করিয়া সে মুচ্‌কি হাসিল।

সব দেখিয়া শুনিযা যতীশের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। ইহাদের সহিত একদিন নয় তুইদিন নয়—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তাহার কাটাইতে হইবে!

হঠাৎ তাহার বাঁ হাতে টান মারিযা একটা প্রৌঢ় মুসলমান কয়েদী কহিল—"আপনি এদিকে আসুন বাবু, ওরা সব ঐ এক রকম।"

যতীশ মুখচোরা লাজুক লোক নয়। যাহা অনিবার্য্য তাহার ভয়ে হা-হুতাশ করা তাহার কোন দিন অভ্যাস নয তাহার অন্তরের শুচিতা ক্লিষ্টবোধ করিলেও সে ততক্ষণ স্থির করিয়া লইয়াছে—এই নরককেই তাহার বাসের যোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। মুসলমান কয়েদীটির মুখে সে লক্ষ্য করিল সত্যি সম্ভ্রম ও সমবেদনার ছাপ। সে মৃদু হাসিয়া বলিল—"চল, তোমারই সঙ্গে তুটো কথা কওয়া যাক্।"

*   *   *   *   *

পরদিন ছুটির পরে কয়েদীদের রুদ্ধ আনন্দলিপ্সার উৎকট অভিব্যক্তি সে আরো বিষম। ছুটির ঘণ্টা বাজিবার কয়েক মিনিট পরেই সকলে দুড়্‌দাড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া যুগপৎ একদল কণ্ঠসঙ্গীত ও একদল যন্ত্রসঙ্গীত স্বরু করিয়া দিল। যন্ত্রসঙ্গীত মানে—কেহবা খাবার থালা, কেহ করতালি, কেহ বগল, কেহ্ বা গালবাদ্যে মাতিয়া উঠিল। সেই ঐক্যতানের সঙ্গে বংশী নামে একটা বিপর্য্যয় মোটা লোক এক দুই তিনের পা ফেলিয়া কোমর দুলাইয়া নাচিতে লাগিল। যতীশ ঘাড় বাঁকাইয়া সেই মুসলমান কয়েদী—নূরমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কয়েদীদের ওপর বুঝি কোনো কড়া শাসন নেই ?"

প্রসংসমান দৃষ্টিতে নর্ত্তন-নিরীক্ষণনিরত নূরমহম্মদ চক্ষু কপালে তুলিয়া যতীশের দিকে চাহিয়া বলিল—"বলেন কি বাবু সাযেব !"

ঘরটার বিশ্রী আবহাওয়া যেন যতীশের সর্ব্বাঙ্গ দেহমনের মধ্যে একটা বীভৎস সরীসৃপের মত কাঁটা দিয়া যেন খিযাইষা তুলিয়া শির্‌শির্ করিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে ! এমন সময় সেই কক্ষের অনতিদূরে মচ্‌:মচ্ করিয়া পাঁচ ছয় জোড়া জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপও বুঝি এমন বস্তু-পরিবর্ত্তন সজ্ঘটিত করিতে পারিত না। আওয়াজ কানে আসিবামাত্রই যে যেখানে ছিল বসিযা পড়িয়া কেহ মাথা চুলকাইতে লাগিল, কেহ্ বা নিজের পা নিজেই টিপিতে লাগিল, কেহ বা ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা কহিতে লাগিল। নিমেষে সেখানে আসিল যেন অবিচলিত শান্তির রাজত্ব ! মোটা-বংশী বিশুর পিঠের আড়ালে মুখ লইয়া দ্রুত-নিশ্বাসে ফুলিয়া-ওঠা দেহখানিকে সামলাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল।

দিনের পর দিন যতীশের চোখের সামনে ইহারই পুনরভিনয় চলিতে লাগিল—একদিনের সঙ্গে আরেক দিনের পার্থক্য যেমন উনিশ আর বিশ ! এই আইনসৃষ্ট অমানুষগুলাকে মানুষ করিতে কি দেবতাও

পারেন !—যতীশ ভাবে! এমনি করিয়া দিন কাটে। আট মাস কাটিয়াও গেল।

*   *   *   *   *

ইহার মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জেলের উৎকট জীবনযাত্রা যতীশের কাছে এমন কিছু বিসদৃশ আর ঠেকে না এবং সে ইহাদের সৎপথে লইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছে। প্রথম কয়েক দিন দু' এক জনকে দু' চার কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। সে স্পষ্ট জবাব পাইল যে ওসব মানসিক সৌখীনতা তাহার মতো বাবু-ভাযাদের পোষায়; তাহাদের মত সাধারণ মানুষের এই নরককুণ্ডে পচিতে হইলে এই রকম উৎকট আনন্দই প্রয়োজন। ঝিমাইয়া পড়া মনটাকে চাঙ্গা তো করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে নূতন দুইটি লোকের সঙ্গে যতীশের একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। একজন এফ ঘোষ, বি-এ পাশ, চল্লিশ টাকার কেরাণীগিরি করিত। বৌএর জন্য গহনা চুরি করিয়া জেলে আসিয়াছে। অপরটি ষোল সতের বছরের এক ছোকরা, নাম বিনোদ—ভারী সুন্দর দেখিতে—যতীশ তাহার নাম রাখিয়াছে "বিনোদিনী"। সেদিন ঘোষ আর যতীশের ইণ্টেলেকচুয়েল আলোচনা হইতেছিল—জেল ডিসিপ্লীন লইয়া—এমন সময় বিনোদকে নূরমহম্মদ হাতের কব্জি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল, "এই দেখেচেন বাবু, আপনার বিনোদিনীর কাণ্ড"—এবং বাঁ হাতের মুঠা খুলিয়া দেখাইল—আট দশটা কাঁচি সিগারেট সে যতীশের পকেট হইতে চুরি করিয়াছে। যতীশ এখন সিগারেট খায়, অবশ্য লুকাইয়া। রাগিলে ইংরেজী বুকনি ঝাড়ে, যথাসম্ভব কাজ ফাঁকি দেয় এবং নিঝুম রাতে যেদিন ঘুম আসে না—বালকের মত নিজের দুর্গতি স্মরণ করিয়া কাঁদে।

যতীশ চোখ পাকাইয়া কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—"ফের চুরি, বিনোদিনী—"

বিনোদ দাঁত বাহির করিয়া হাসে! সুন্দর ধব্‌ধবে দাঁত, রাঙা মাঢ়ির তলায় মুক্তার মতো সাজানো। তার অর্দ্ধেক ঢাকিয়া টুক্‌টুকে লাল ঠোঁট কাঁপিয়া কাঁপিয়া সারা হইতেছে। "যাও—আর খবরদার খেন নিও না—মার খাবে"—যতীশ বলিল।—নূরমহম্মদ বিনোদের কব্জি ছাড়িয়া দিলে বিনোদ নূরের পিঠে এক চাঁটি মারিয়া কহিল—"ভারী বল্লেন—নালিশ ক'রে ওঁর গুট্‌ঠাউরের কাছে।" নূরমহম্মদ গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সে এই ছেলেটাকে দেখিতে পারিত না। গায়ের চামড়া কটা বলিয়া সবাই যেন আস্কারা দিয়া ইহাকে মাথায় তুলিয়াছে!

বিনোদ আসিয়া যতীশের গা ঘেঁসিয়া বাধ্য শিশুটির মত বসিল। এর পর ঘোষের সঙ্গে তর্ক আর তেমন জমিল না; ঘোষ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "যাও তোমার বিদোদিনীকে নিয়ে একটু বাইরে ঐ দিকে ঘুরে এসো।" রাজার জন্মদিন বা অম্‌নি কোনো একটা কিছু উপলক্ষে সেদিন কাজ অর্দ্ধেক দিন ছুটি।

শরতের শান্ত অপরাহ্ণ। এই মাত্র এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাঙা মেঘের আলো আসিয়া বিনোদের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কপোলে ললাটে কণ্ঠে কাঁধে লুটাইতেছে। চৌদ্দ ফিট্ উঁচু দেয়ালের ওপারে একটা মস্ত শিশুগাছ, তাহার মগডালের ছায়াটা আসিয়া জেল-কম্পাউণ্ডের ভিতরে পড়িয়াছে। সেইখানে দুইজন বসিল। বিনোদ চালাক ছেলে—সে যতীশের হাতখানি থাকিয়া থাকিয়া আদর করিয়া নিজের গালে চাপিয়া ধরিতেছে। যতীশ সেই সুকুমার মুখের দিকে আপনা-ভোলা হইয়া চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ সে এম্‌নি ছিল জানে না—হঠাৎ একটা কাকের কর্কশ ডাকে সম্বিৎ পাইয়া দুঃসহ লজ্জায় ও রাগে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বিনোদের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া সে নিজের মুখ ঢাকিল। হঠাৎ যতীশের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া

বিনোদ চুপি চুপি তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চারিদিকে চট্ করিয়া একবার তাকাইয়া বলে—"একটা সিগারেট খাবে, চারপাশে কেউ নেই—" হঠাৎ মুখ খিঁচাইয়া যতীশ বলে—"বিনোদ তুই যা—পালা এখান থেকে বল্‌চি।"

ছেলেটা হতভম্ব হইয়া যায়। ফের যতীশ খিঁচাইয়া ওঠে—"গেলি নে হতভাগা—এমন এক চাঁটি মারব"—

বিনোদ আস্তে আস্তে অবাক হইয়া সরিয়া পড়ে। তাবপর যতীশের দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে।

রাতে ঘোষের সঙ্গে দেখা। চোখে তখনো তাহার জবাফুলের মত লাল। যতীশ বলে, "ভাই ঘোষ, কি ক'রে বাঁচি বলত। যে-দেহের কোনো দাবী নিজের উপর স্বীকার করিনি, বোধ করিনি—ঘোষ, তা যে আমায় এবার পুড়িয়ে মারছে! একটি নারীকে জীবনে আমার ভালো লেগেছিল, কিন্তু তাকে কেন্দ্র ক'রে কোনোদিন লালসার আবর্ত্ত সৃষ্টি কর'তে পারে নি। তার চিন্তা আমার কর্ম্মযজ্ঞে ধূপসুরভির মত গগন অচ্ছন্ন ক'রে থাকত। সেই আমার আজ একি হ'ল ঘোষ বলতে পার? ক্রিমিকীটের মত ক্লেদপূর্ণ পঙ্কিলতা ছাড়া আমার যেন আজ উপায় নেই। অথচ সমস্ত অন্তরাত্মা ঘিন্‌-ঘিনও করে। আমি কি হ'লাম, কি হ'লাম।"—বলিয়া যতীশ হাতে হাত রগড়াইতে লাগিল। চক্ষে ও ঠোঁটের কোণায় রুদ্ধ আক্রোশ গর্জ্জাইতেছে—পারিলে যেন সে নিজেকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। ঘোষ নিঃশব্দ সহানুভূতিতে যতীশের কাছে সরিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ঘোষের বয়েস একটু বেশী—সে জানে দেহের জুলুম কি কদর্য্য, কি ভয়ানক। ঘরে অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী তাহার বসিয়াছিল —"যাও আমার কাছে আর এসোনা। বারো বছর বিয়ে করেচ, একগাছা রুলি পর্য্যন্ত দিতে পারলে না। ভারী আমার ভালোবাসা।

তবেই না ঘোষ চোর হইয়াছে! সে জানে ভদ্রসন্তান হইয়া কিসের তাড়নায় চুরিও তাহার কাছে শ্রেয় হইয়াছিল।

২২

মাসকয়েক গত হইল যতীশ জেলে গিয়াছে। কিন্তু সংসারের পক্ষে অকেজো এই লোকটি বিদায় হইবার পর পরিবারের রূপান্তর হইয়াছে অনেক। খাওয়া-দাওয়া স্কুল-কলেজ কাছারী—এসবের কাজ চলিয়াছে একই তালে, কিন্তু শ্রাবণ ঘনঘটাচ্ছন্ন বাদলসন্ধ্যার মত একটা ম্লান ছায়া যেন সকলের উজ্জ্বল আনন্দকে চাপিযা বসিয়াছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের পার্টি-ফার্টি প্রায় বন্ধ—অবশ্য বিনয় এখনও প্রায়ই অপরেশবাবুর সহিত গল্প করিবার অছিলায় আসে এবং লীলার সহিত দুইচার মিনিট নিভৃত অবকাশের সুযোগ খুঁজিয়া ফেরে। লীলার এখন সেই বয়েস যখন কোন দুঃখ মনকে বেশীদিন অভিভূত করিয়া রাখিতে পারেনা। ইহাই যৌবনের একাধারে গৌরব ও দুর্ব্বলতা। দেখা গেল এই ধাক্কা সেই কাটাইয়া উঠিল প্রথম এবং তাহার স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"মেজদা'র জন্য দুঃখ না ক'রে—করা উচিত আনন্দ,—তিনি দেশের জন্য কারাবরণ করেছেন। পরাধীন দেশের মানুষের এর চাইতে বড় গৌরব কি আর কিছুতে আছে নাকি!"

রমাও ভাবে সত্যই তো, ইহার চাইতে বড় গৌরব কি আর আছে—এই আদর্শের জন্য সাধনা! তাহার মামলার বিবরণ সে খুঁটিনাটি পড়িয়াছিল—রমা জানিত যতীশ সাধারণ বিপ্লবী নয়, রুশিয়াব সেভিয়েটদের সহিত কি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যতীশের ঘরে ইদনীং গাদা গাদা পলিটিক্সের বই জড় হইয়াছিল, রমা সে সব ঘাঁটিয়া কমিউনিজ্‌মের মূলসূত্র আবিষ্কার করিল। কি সুমহান্ ত্যাগের আদর্শের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত! কি

সার্ব্বভৌমিক ইহার সাধনা ! দেশের গণ্ডীতে ইহার আদর্শের পরিধি সীমাবদ্ধ নহে, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ইহার বিস্তার। হোক না ইহার সাফল্য অবিশ্বাস্য, সুদূর-পরাহত—তবু জীবন যদি উৎসর্গ করিতে হয় ত এত বড় আদর্শের জন্যই করা উচিত। সার্থকতা দিয়া তো জীবনের পরিমাপ নয়—ইহার আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও তাহার সাধনা দিয়াই তাহার সত্যিকার মূল্যবিচার হয়। যতীশের জীবন সমগ্র বিশ্বের যত নিপীড়িত দুঃস্থের জন্য—এই কথা মনে করিয়া রমার বুক তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু তাহার অন্তরে যতীশের জন্য শুধু শ্রদ্ধাই সঞ্চিত হইতেছিল কি ? যখন তাহার খালি ঘরটার দিকে দৃষ্টি পড়িত—বুকটা বেদনায় এত টন্‌টন্ করিয়া উঠে কেন সে ভাবিয়া পায় না। কয়দিনের পরিচয় তাহার এই লোকটির সঙ্গে এবং এই স্বল্প পরিচয়েও সে কি শুধু অবহেলা অপমানই তাহার নিকট হইতে পায় নাই ? তা ছাড়া ঐ ঘরটিতে সে কতটা সময়ই বা থাকিত ? আজ দেরাদূন, কাল শিলং, পশুর্ লক্ষ্ণৌ—এম্‌নি তো ছিল তার গতি। মাসে এক সপ্তাহ ছিল তাহার ঐ ঘরখানিতে অবস্থিতি ; তবু তাহার অনুপস্থিতিতেও ঐ ঘরখানি তাহার কর্ম্মপ্রাণ অস্তিত্বের মূক সাক্ষী ছিল। এখন ঐ ঘরটা যেন তাহার জেলের কয়েদীর রূপটাই মনে করাইয়া দেয়। হয়ত যতীশ জাঙিয়া পরিয়া খালি গায়ে ঘানি ঘুরাইতেছে, হয়ত ক্ষেতের মাটি চষিতেছে—হয়ত—রমার দুই চক্ষে জল ভরিয়া আসে। এম্‌নি ভরিয়া আসে অশ্রু আর একটি মানুষের চোখে, তিনি যতীশের পিতা। অপরেশবাবুর সঙ্গে রমার বন্ধন যেন দিন দিন দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছিল এবং যে অদৃশ্য রজ্জু দুইজনাকে এমনি করিয়া একত্র বাঁধিতেছিল সে হইল যতীশের প্রতি এই দুইটি মানুষের মমত্ববোধ।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া রমা এলোমেলো নানা কথা ভাবিতেছে, এমন সময় ভৃত্য ভজুয়া বৈকালিক মেলের একখানা মোটা খামের চিঠি

তাহার হাতে দিয়া গেল। লেফাফার উপর হাজারিবাগ জেলের 'Passed by Censor' ছাপ মারা! হঠাৎ তাহার বুকের সমস্ত রক্ত ছলাৎ করিয়া যেন হৃৎপিণ্ড হইতে উছলাইয়া পড়িয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ অবশ করিয়া আনিল। কিছুক্ষণ সে চিঠিখানা মুঠার মধ্যে সজোরে ধরিয়া নিজের ঘরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল; তারপর বক্ষস্পন্দন মৃদুতর হইলে খুলিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমেই পাঠ দেখিয়া সে অবাক্! তাহাতে লেখা:—

হাজারিবাগ জেল।
তারিখ—

রমা, আমার এরকম চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হবে, হয়তো বা জেলে আমার মাথা বিগড়ে গেছে এই মনে করবে; কিন্তু এ পত্র না লিখে আমার নিষ্কৃতি ছিল না। নিজেকে শাসিয়েছি বিস্তর। জেলের বাইরে কাজ ছিল, তাতে তখন ডুবে থাকতুম। তুমি আমার কাজের অন্তরায় ব'লে তোমাকে ঘৃণা ক'রবার চেষ্টা করতুম, ভাণ করতুম। কিন্তু এখানে আমি দুর্ব্বল—বড় অসহায় হ'য়ে পড়েছি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমি আজ ক্ষতবিক্ষত, তুমি তাতে স্নিগ্ধ প্রলেপ দাও। আমায় তোমার একবারও মনে পড়ে কি? মনে হয় বুঝি পড়ে—নৈলে তোমায় এ চিঠি লিখ্‌তে পেতাম না।

তোমায় আমি অবহেলা দেখিয়েছি তা তুমি ভুলে যেও। জান্‌বে সে আমার সত্যিকার অবহেলা নয়; সে তোমার থেকে আত্মরক্ষা ক'রতে আমার অক্ষমতার প্রতিক্রিয়া। আমি তো পরাজয় স্বীকার কচ্চি রমা!

নারী আমার কাছে নরকের দ্বার নয়, নারী আমার কাছে অবহেলার বস্তু নয়, তবু তোমায় কেন আমি এড়িয়ে চলেছি তার কৈফিয়ৎ দিচ্চি। আমাদের সাধনার পক্ষে শান্তিময় পারিবারিক জীবনযাপন সম্ভব নয় এই জন্য। আমার জীবন বিপদ্‌সঙ্কুল, তার সঙ্গে তোমায় জড়াতে চাওয়া স্বার্থপরতা মনে হোতো। কিন্তু এখানে এসে অবধি ভাবচি—বিবাহই যৌন-জীবনের একমাত্র পরিণতি নয়; একথা শুন্‌লে তুমি হয় তো শিউরে না-ও উঠতে পারো, কারণ তুমি সংস্কারান্ধ মেয়েমানুষ নও। যুক্তির স্বচ্ছ প্রখর আলো তোমার মন উদ্ভাসিত ক'রে আছে। আমি তোমায় বিয়ে ক'রতে পারি না, কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি, সৃষ্টির

প্রথম দিন থেকে যত প্রেমিক তাদের প্রিয়ার জন্য চোখের জল ফেলেচে, আমার ভালোবাসা তাদের কারো চাইতে দুর্ব্বল নয়—এ কথা তোমায় আমি জানাতে চাই। বিগত পক্ষাধিককাল আমার মুখে রুচি নেই, রাতে ঘুম নেই—বুকে অহরহ রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটচে। আজ তোমার কাছে অন্তরের বোঝা নামিয়ে স্বস্তি পেলুম। যে কদর্য্যতার পাঁকে অহরহ ডুবে আছি, তোমায় শুধু 'ভালোবাসি' এই কথাটি ব'লে যেন তার অর্দ্ধেক কুশ্রীতা অপনীত হ'য়ে গেল। নাই বা তোমায় পেলাম—তথাপি আমার সুখ তুমি কেড়ে নিতে পারবে না—তোমায় ভালোবেসেচি, তোমায় সে কথা বলেচি। ইতি

যতীশ

চিঠি পড়িতে পড়িতে রমার অশ্রুধারায় বুক ভিজিয়া গেল।

রমা কাগজ কলম লইয়া পরদিন উত্তর দিতে বসে। কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেখে কিছুই লেখা যায় না, কিছুই মনের মত হয় না। তিনখানা চিঠি তখন লিখিয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিল। তারপর হতাশ হইয়া ভাবিল, দুই একদিন সময় লইয়া কথাগুলা গুছাইয়া লিখিলেই চলিবে। কিন্তু দুই দিন গেল, তিনদিন গেল, চারদিন গেল। তারপর জবাব দিতে অযথা বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম দিনে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া শুধু লিখিল—

শ্রীচরণেষু,

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাকে কি লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না। এ হতভাগিনীর দিবার যোগ্য কোনো সম্পদই নাই যে! ইতি

রমা

জীবনের বিচিত্র গতি! পত্র ডাকে দিয়া রমা ভাবিতে লাগিল নিয়তির দুর্ব্বার আকর্ষণ তাহাকে কোন্‌দিকে টানিয়া লইতেছে কে জানে? বিজয়কুমারের জন্যও তাহার চিত্ত এমনি উন্মুখ হইয়াছিল তো? কিন্তু পরক্ষণেই মন বলিল, না—এত ভাল হয়ত বিজয়কে সে বাসে নাই। তা' ছাড়া সে কপট অসচ্চরিত্র। যতীশের পাশে তাহার আসন! কিন্তু আশ্চর্য্য যে বিজয়ের কপটতা ও অসচ্চরিত্রতা সে কোন দিন ঘৃণার চক্ষে দেখে নাই! আজ তবে সে নজির কেন?

২৩

ইহার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। বিনয়ের ঠাকুরমা তাহার বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করায় পুত্রের ইঙ্গিতানুযায়ী তাহার পিতা অপরেশের নিকট লীলার সহিত বিনয়ের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থাপিত করিলেন। অপরেশের অমত করিবার কিছুই ছিল না; যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। লীলা শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় রমার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়া গেল, "কবে যে মেজদা ফিরবেন জানিনে রমাদি;—তোমার যত্নে আছেন বলেই বাবাকে কতকটা নির্ভাবনায় ছেড়ে যেতে পাচ্চি, নৈলে মেজদা যাবার পর তাঁর যা শরীরের অবস্থা হয়েচে!"

বাস্তবিকই যতীশের জেল হওয়ার পর অপরেশের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকেন, প্রায়ই চোখের জল ফেলেন। রমা হইয়াছে তাঁর পক্ষে অন্ধের যষ্টি। উঠিতে বসিতে খাইতে বাগানে সান্ধ্যভ্রমণে রমাকে তাঁহার চাই। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হয় রমার এই বয়সে তাহার মত বৃদ্ধ রুগ্নের পরিচর্য্যা করিতে নিশ্চয়ই আনন্দে চিত্ত ভরিয়া উঠে না এবং তিনি স্বার্থপরের মত নিজের আরামের জন্য এই আশ্রিতা মেয়েটির উপর হয়ত জুলুম করেন। কিন্তু একদিন ইঙ্গিতে সে কথা উত্থাপন করিতেই রমা এমন কাঁদিয়া হাট বসায় যে অপরেশ নিঃসঙ্কোচে তাহার পর হইতে তাহার কাছে সেবা লইতেন। এই মেয়েটিকে তিনি বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন; পত্নী-বিয়োগের পর আর কাহারও যত্নে যেন এত আন্তরিকতার স্পর্শ তিনি পান নাই--এমন কি পুত্রবধূ বা কন্যার সেবাতেও না।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত অপরেশের পায়ে গরম জলের সেক দিয়া রমা তাহার ঘরে আসিয়া শুইল। কিছুতেই তাহার ঘুম আসিতেছে না; এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে উৎপাত সুরু করিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রি।

সুবিস্তার বাগানের মাঝখানে অপরেশের বাড়ী। রমার ঘরের বাইরের দিকের দরজা খুলিলে বাগানের একটা সরুপথে পড়া যায়। সেখান হইতে তিন-চার হাত দূরেই একটা হাস্‌নাহেনার ঝাড়। মৃদু হাওয়ায় তাহার মিষ্ট গন্ধ রমার ঘরে ভাসিয়া আসিতেছিল। হেনার ঝোপে থাকিয়া থাকিয়া ঝিঁঝি-পোকার কলতান রাত্রির নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘাবৃত চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না খানিকটা খোলা জানালা দিয়া ঘরের মেঝেয় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একটা টাইমপিস্‌ ঘড়ি টিক্‌ টিক্‌ করিয়া বাজিয়া চলিয়াছে। রমা বিরক্ত হইয়া আলো জ্বালিয়া একটা বই লইয়া বসিল। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ বাইরের দিকের দরজায় রমা যেন মৃদু করাঘাতের শব্দ পাইল। কান খাড়া করিয়া সেদিকে মনোযোগ দিতেই আবার দ্বারে করাঘাত; সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় কে বলিল,—"দরজা খোল।" রমার দেহ ভয়ে আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইবার মেয়ে নহে। আস্তে আস্তে দরজার পাশে গিয়া সে কান পাতিল। এইবার সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল—"আমি যতীশ, পালিয়ে এসেছি, শীগ্‌গির দরজা খোল রমা।" এই কণ্ঠস্বর রমার ভুল হইবার নয়। সে ত্রস্তহস্তে আলো নিবাইয়া দরজা খুলিয়া দিল।

যতীশ ঘরে ঢুকিল বিচিত্র বেশে! চোস্ত-পাজামা আর আচকান পরা, মাথায় পাগড়ী, চোখে চশমা, মস্ত গোঁপ! তাহাকে একদম চেনা যায় না। ঘরে ঢুকিয়া রমার বিছানার উপর বসিয়া সে নকল গোঁপ ও চশমা জোড়া খুলিয়া বলিল—"জেলে বন্ধ হ'য়ে থাকা আমার পোষাল না রমা, পালিয়ে এলুম।"

রমার বাক্‌শক্তি যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, সে শুধু মাথা নাড়িল—তাও অর্থহীনভাবে। যতীশ তাহার হাত ধরিয়া একেবারে

কাছে টানিয়া বলিল—"তুমি যে ভীষণ ঘাবড়ে গেছ দেখ্‌চি, চেঁচিয়ে আমার আগমন জানিয়ে দেবে নাকি ?"

সে কথায় উত্তর না দিয়া রমা এইবার বলিল, "পালিয়ে তুমি বাড়ীতেই এলে, পুলিশে এখানেই আগে খোঁজ করবে না কি ?"

মৃদু হাসিয়া যতীশ বলিল, "ঠিক তার উল্টো। আমার মত ফেরার জেল থেকে পালিয়ে বাপ-মা'র আদর খেতে বাড়ী ফিরে যায় না এ তারা বিলক্ষণ জানে। তাই এখানে খোঁজ পডবে সব চেয়ে শেষে। তা যাই হোক তোমাকে একবার না দেখে ফের মরণের খেলায় ঝাঁপ দিতে মন সরল না—।"

সেদিকে একবার চাহিয়া কম্পিতবক্ষে রমা প্রশ্ন করিল,—"কি করে তুমি পালালে ? কি করে ? কি ক'রে বা এতদূর এলে ?"

হাসিয়া যতীশ বলিল—"হাওয়ায় উড়ে আসিনি গো—রেলগাড়ী চড়েই এসেচি ; আর কি ক'রে পালালুম সে অনেক কথা। কেন, খবরের কাগজে দেখনি যে হাজারিবাগ জেল হইতে কয়েদী পালিয়েচে ?" রমা উত্তর দিল "কাগজ প্রায়ই দেখি বটে, তবে ও খবরটা হয়ত কোন কারণে নজরে পড়ে নি। কিন্তু তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েচে ত আজ ?"

যতীশ তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—"কেন, তা নৈলে শরৎবাবুর নায়িকাদের মত রাঁধতে লেগে যাবে নাকি আমার জন্য ?"

রমা বলিল, "না। তবে ভাঁড়ার থেকে কিছু তৈরী খাবারের চেষ্টা দেখ্‌তে পারি চুপিচাপি।"

"সে সব এখন থাক। ওসব আমার হ'য়ে গেছে, আমরা উপোসী থাকি নে কখনও। এবার তোমার সঙ্গে দুটো কথা ক'য়েনি—আবার সাড়ে চারটায় আমায় পালাতে হবে।"

তারপর কত কথা। তার কতকগুলার অর্থ আছে, বেশীর ভাগের নাই। যতীশ অনাবশ্যক কথা বলিতে পারে রমা কদাচ ভাবিতে পারিত না; সে স্বপ্নেও জানিত না এই শুষ্ক কাঠখোট্টা মানুষটির মধ্যেও অনুরাগের এমন উজ্জ্বলতা থাকিতে পারে! রাত যখন চারটা যতীশ বলিল, "এবার পালাই।"

"এখনি?"—যতীশ তাহার মনিবন্ধের ঘড়ি তুলিয়া একটু হাসিয়া রমাকে দেখাইতে সে বলিল, "ওমা, এর মধ্যে চারটে বেজে গেল?"

যতীশ আবার হাসিয়া বলে, "আমাদের জন্য তো সময় ব'সে থাকবে না। আচ্ছা আসি তবে। কাল যদি এলাহাবাদে থাকি, রাত ১২টা থেকে একটার মধ্যে পারি তো আসব। তবে এলাহাবাদে থাকা আমার পক্ষে মুস্কিল—চারদিকে সবাই জানে আমায়।"

যদি কেহ যতীশকে চেনে—কল্পনায় রমা শিহরিয়া বলিল, "তার চাইতে তুমি এলাহাবাদ ছেড়ে আজই চলে যাও।"

যতীশ হাসে আর বলে—"কিন্তু এখানে কাজ আছে যে কাল পর্য্যন্ত। ভয় কি রমা, জানই ত আগুন মোদের খেলার জিনিস, দুঃখ মোদের পায়ের দাস!"

রমা তার ভীরু চোখ নামাইয়া অস্ফুটে বলে—"আমার যে অত সাহস নেই!"

এবার যতীশ গোঁফজোড়া নাকের নীচে চাপিয়া দেয়, রিভলভারটা পকেটে ফেলিয়া চশমাটা হাতের মুঠায় লইয়া ধীরে ধীরে বাগানের অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

পরের দিন রমার কাটে না! ঘড়ি যেন সব বিকল হইয়া গিয়াছে; সূর্য্যের গতি অস্বাভাবিক মন্থর! ভোর হয় ত দুপুর হয় না, দুপুর হয় ত সন্ধ্যা হয় না। কিন্তু অবশেষে সন্ধ্যাও হইল, ক্রমে সবাই খাইয়া দাইয়া

শুইতে গেল; নিশীথের নিস্তব্ধতা তারাখচিত আকাশের তলে ঝিমাইতে লাগিল। বাগানের দিকের দরজা খোলা রাখিয়া রমা সজাগ বিছানায় শুইয়া। রাত্রির অন্ধকারে এক ঘরে তাহার মত অবিবাহিত এক নারী এক পুরুষের প্রতীক্ষা করিতেছে—ইহাতে যে লজ্জা আছে, সমাজের চক্ষে যে ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ—ইহা রমার মত শিক্ষিতা মেয়ের কি একবারও মনে হইল না? দুই চক্ষু মেলিয়া সে বাইরের অন্ধকার যেন গিলিতেছে। ক্রমে গির্জ্জার ঘড়িতে বাজিয়া চলিল বারোটা, একটা, দুইটা। নিদ্রাহীন চক্ষু তাহার জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষে ঘুম নাই। তাহা হইলে যতীশ আর আজ আসিতে পারিল না। পাগল সে—কি বিপদে পড়িল কে জানে?—এই কথাই মনে উঠিল সর্ব্বাগ্রে। তারপর মনে হইল কাজের লোক—হয় ত হঠাৎ এলাহাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে। যদি গিয়াছে ত যাক—শুধু ভগবান্ তাহাকে দৈহিক কুশলে রাখুন। হউক না যতীশ কমিউনিষ্ট, ভগবান্ মানে না—কিন্তু সে তো মানে। তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা কি ভগবান শুনিবেন না—ক্রমে কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ মধ্য গগনে পৌঁছিয়া ফিকে আলো ছড়াইতে ছড়াইতে পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া পাংশু হইয়া গেল। কাক দুই একটা ডাকিয়া উঠিল কা—কা। রমার যেন বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া উঠানে পড়িল। কলতলায় খুব খানিকটা ঠাণ্ডা জল চোখেমুখে ছিটাইয়া ষ্টোভ ধরাইতে গেল। সে রোজ প্রত্যুষে নিজ হাতে অপরেশবাবুকে চা করিয়া দেয়।

কিন্তু না। দিনে দিনে সপ্তাহ উৎরাল। সপ্তাহ ঘুরিয়া আসিল মাস। কিন্তু যতীশের কোন সংবাদ নাই। মানসিক উৎকণ্ঠার চিহ্ন রমার মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। চেষ্টা করিয়া তো তা আর ঢাকা যায় না? যে দেখে সেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে তাহার শরীর কি

অসুস্থ? রমা আরও মরমে মরিয়া যায়। সময়ে সময়ে তাহার এই ভাবিয়া আনন্দও হয়।—যে তপঃক্ষীণা গৌরীর মতো সেও তাহার প্রিয়ের জন্য দেহ তিলে তিলে ক্ষয় করিতেছে।

হঠাৎ একদিন শেষে যতীশের একখানা চিঠি আসিয়া পৌঁছিল—না বুঝিল সে তাহার মাথা, না মুণ্ডু। তাহাতে লেখা—

"দেবী, তোমারি কৃপায় আমাকে আমি ফিরিয়া পাইয়াছি,—তোমায় প্রেম জানাইতে কুণ্ঠা হয়—নমস্কার নও।" আমবালার ছাপ!

আবার দশ বারো দিন বাদে আর দুই লাইন:

"শীঘ্রই বোধ হয় ওদিকে যেতে হবে। সে সৌভাগ্যের কথা মনে ক'রে সময়ে সময়ে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকি।"

রমার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া এক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া আসিতে চায় যেন। সে দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়ে। আবার রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটে। কিন্তু অন্তরের আশঙ্কা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রিয়মিলন আসন্ন—রমার চোখের কোলের কালী ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসে। গালে আবার আসে লালের ছোপ। কলেজের বই এর সঙ্গে তো আজকাল আড়ি হইয়া গেছে। রমা রাতের আঁধারে গুন গুন করিয়া গায়—"বাজ্‌ল তূর্য্য আকাশ পথে সূর্য্য আসেন অগ্নিরথে!"

কল্পনার চক্ষে সে স্বপ্ন দেখে—ভারতবর্ষের দুর্দ্দিনের ক্লিষ্ট অন্ধকার ভেদ করিয়া ঐ কাহার বিজয় রথ আসিতেছে—হস্তে তাহার উদ্দাম চঞ্চল অশ্ব-বল্গা, মস্তকে তাহার ভগবানের আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়িতেছে—রথী শ্যামকান্তি যতীশ। রমার রোমাঞ্চ হয়। থাকিয়া থাকিয়া চক্রধরপুরের কথা মনে পড়ে না। বিজয়ের কথাও কি মনে পড়ে না?—সেই তো তাহার ঘুমন্ত যৌবনকে জাগাইয়াছিল। তারপর আসিল কত বেদনা-

বিক্ষুব্ধ রাত্রি—আবার কি জীবনের নবারুণোদয়ের সূচনা হইল! পদ্মপত্রে জল-বিন্দুর মত অন্তরের পাত হইতে যে বেদনাশ্রুধারা কবে পিছলাইয়া কালসমুদ্রের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে জানে না। আবার সূর্য্যের আলো ভালো লাগে, ভালো লাগে পাখীর গান, দক্ষিণা হাওয়া, শরতের মেঘ।

শীতের তীক্ষ্ণতা পৃথিবীকে করে রিক্ত, ব্যথাতুর, বৈরাগী। কিন্তু ধরিত্রীর যৌবন অমর অজেয়—বসন্তে আবার সে মঞ্জরিত হয়—আবার জন্ম নেয় তাহার নব-যৌবন। ধরিত্রীর সন্তান মানুষেরও সেই এক চেষ্টা। তাহার যাত্রাপথে কত সুখের দোলা কত দুঃখের প্লাবন; কত আশার নব জন্ম, কত নৈরাশ্যের অন্ধকার, কত জয়ের দুন্দুভিধ্বনি, কত পরাজয়ের গ্লানি। কিন্তু এই আবর্ত্তের ভিতর দিয়া চলে জীবনের অবারিত গতি, দুঃখকে দুই ধারে ঠেলিয়া দিয়া সুখকে করে বরণ—এ জয়যাত্রায় তাহার প্রধান অস্ত্র যৌবন। যৌবন দৈন্য জানে—কিন্তু মানে না পরাজয়। এই যৌবন যখন মরে জীবনের কি আর তখন মূল্য? তখন তাহার একটানা পরাজয়ের ইতিহাস হয় সুরু। রমার যৌবন তেমনি দুঃখের সাগরে তাহার জীবন-তরীকে বানচাল হইতে দিল না।

কিন্তু তিলে তিলে পলে পলে মানুষে যে আশার সৌধ গড়িয়া তোলে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুরাঘাতে এক লহমায় তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এমনি যখন রমার জীবনপাদপ পৃথিবী হইতে রসসংগ্রহের চেষ্টায় দ্বিতীয়বার উন্মুখ হইয়া উঠিল—অভাগিনীর কপালে তাহা সহিল না এবং শুধু তাহার নয়, অপরেশবাবুর সমস্ত পরিবারের উপরেই বজ্রাঘাত হইল। রাস্তায় সেদিন সংবাদপত্র বিক্রেতারা চেঁচাইতেছিল—

"জবর খবর পুলিশের সঙ্গে পলাতক আসামীর রিভলবার যুদ্ধ; পুলিশ খুন, আসামীও খুন।"

ব্যাপার এই—যতীশের অবস্থিতি টের পাইয়া লাহোরে পুলিশ এক রাত্রে

তাহাকে অনুসরণ করে। শহরের বাহিরে একটা আম্রবনের মধ্যে পলায়ন অসম্ভব বিবেচনায় সে একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় লয় ও রিভলবার চালাইতে থাকে ফলে দুইজন পুলিশ ও সে নিহত হইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া রমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অপরেশবাবুর শরীর একেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, এই সংবাদ পৌছিবার দিন সন্ধ্যাবেলা হার্টফেল হইয়া তিনি মারা গেলেন। রমা দ্বিতীয়বার যুগপৎ প্রিয়হারা ও পিতৃহীনা হইল।

উপসংহার

ধীরে ধীরে কালপ্রবাহ বহিয়া চলে। একে একে কুড়ি বৎসর গড়াইয়া গেল। দৈবের বিচিত্র গতি। মাদ্রাজে কোনো স্কুল পরিদর্শনে গিয়া অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রৌঢ় অধ্যাপক শ্রীবিজয়কুমার দত্ত দেখেন—রমা সেখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছে। রমাকে হারাইয়া বিজয়কুমার উদাস হইয়া কিছুদিন ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর তাহার নিজের জন্য মাসিক পাঁচশো টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত রাখিয়া বাকী সমস্ত সম্পত্তি একটি নারী চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য এক বোর্ড অব ট্রাষ্টের হাতে দিয়া দেয়। পরে চিত্ত-নিরোধের জন্য আবার আরম্ভ করে পড়াশুনা। দুই বৎসর পরে সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি লইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যায় এবং বছর তিনেক পর ডি-লিট হইয়া পুনরায় দেশে ফেরে। এইবার তাহার পড়ার নেশায় পাইয়াছিল। বাড়ীতে রাশি রাশি বই জমিয়া উঠিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরেই অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার আমন্ত্রণ আসে ও সে সেখানে কাজ লইয়া চলিয়া যায়। রমাও তাহার ভবঘুরে জীবনে বিজয়ের নিয়োগের সে সংবাদ কাগজে দেখিয়াছিল। তবে খুব সন্দেহ হইলেও একেবারে ঠিক করিতে পারে নাই এই সেই বিজয়কুমার দত্ত কি-না; কারণ,

পি-এইচ্‌-ডি, ডি-লিট্‌— সে পূর্ব্বে ছিল না। তারপরও প্রায় বারো বৎসর পর তাহাদের দেখা। বিজয়ের প্রথম দৃষ্টিতে প্রত্যয় হয় নাই যে রমা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কিন্তু না, তাহা কি ভুল করিবার? নাই বা থাকুক যৌবনের সেই দীপ্তি, চর্ম্মের সে মসৃণতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সে তারুণ্য, চঞ্চলতার আভাস;—হউক না কুঞ্চিত কেশের মধ্যে সিতিমার প্রক্ষেপ—কিন্তু সেই তো মুখ, সেই চাহনি, সেই দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি, সেই কপালের উপর লুটাইয়া পড়া অবাধ্য চুলের গোছাটি পর্য্যন্ত!

"আপনি এখানে?—" বাঙ্গালায় বিজয়কুমার বলিলেন,—তাঁহার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট কাঁপিতেছিল। মাটির পানে চাহিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রমা বলিল—"হ্যাঁ—"

"ওঃ—কত আপনাকে এই বিশ বছর ধরে খুঁজেচি—শেষে যে আপনার দেখা পেলাম এ যেন বিশ্বাস হচ্চে না। কিন্তু আপনার আত্মীয়-স্বজন এখানে কে আছেন?"

"কেউ না। আমি বোর্ডিংএ থাকি।"

"আপনার সঙ্গে কথা কইবার সময় কি করে পাব বলুন না। অনেক যে আছে কথা বল্‌বার।"—ছেলেমানুষের মতো প্রৌঢ় অধ্যাপক বলিয়া চলিলেন।

"কিচ্ছু কথা নাই তেমনি—" নতমুখে রমা বলে।

এইবার কিন্তু বিজয়কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—"একবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়েচেন—কিন্তু আমার যা বক্তব্য আছে আপনাকে শুনতেই হবে—" স্থিরপদে হেড্‌-মিষ্ট্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া বলেন—"**Miss Sen is an old acquaintance, Excuse us for a quarter of an hour**—" এবং এক রকম হুকুমের জোরেই বলিয়া বারান্দার এক প্রান্তে রমাকে লইয়া এক নিশ্বাসে যাহা বলিয়া গেলেন তাহার মর্ম্ম এই: তরুবালার

শয়তানির কথা যখন বিজয় জানিতে পারেন তখন রমা চক্রধরপুর ছাড়িয়া গিয়াছে ; সেই হইতে অজানা অন্ধকারে রমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি প্রৌঢ় হইয়া গেলেন। আর রমা যাহা ভাবিয়াছে তাহা নহে ; তরুবালা গণিকা মাত্র—সে বিজয়ের কেহ নহে, কোনোদিন কিছু ছিলও না।

* রুদ্ধকণ্ঠে তিনি শেষ করিলেন— "এই মাত্র আমার বলবার ছিল। এটুকু বলবার অধিকার আমি ছাড়তে রাজী নই। আপনি যদি অতীতের ওপর যবনিকাই টেনে দিতে চান অবশ্য সে জন্য আমার কিছু বলবার নেই। আচ্ছা বিদায়। আপনার ইতিহাস জানতে অদম্য ইচ্ছা হচ্চে কিন্তু জিজ্ঞাসা করে আর ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রব না।"

পনের মিনিটও লাগিল না—দশ মিনিটেই কথা শেষ হইয়া গেল এবং মিস্ সেন শিক্ষয়িত্রীদের দলে নিঃশব্দে মিশিয়া গেল।

বৃদ্ধবয়সে মানুষের চিত্তসংযম নাকি ঘটে—কিন্তু বিজয়কুমার নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না। অত্যল্প পরে শরীর অসুস্থতার অছিলায় সেদিনকার মত পরিদর্শন বন্ধ রাখিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন।

সপ্তাহান্তে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া বিজয়কুমার রমার একখানা চিঠি পান, তাহাতে লেখা—

"জীবনের অপরাহ্ন বেলায় আপনার সঙ্গে ফের দেখা হোলো—যখন আমি রিক্ত, যখন আমার কিছুমাত্র গৌরব ক'রবার না আছে উপায়, না আছে ইচ্ছা। আপনি আমার সংসর্গ থেকে দূরে থাকুন—সেই ভালো, জানেন, আমার স্পর্শে বিষ আছে! আপনার একাগ্র প্রেমের সামনে এ কথা উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে—কিন্তু তবু বলচি—জীবনে আমি আর একজনকেও ভালোবেসেছিলাম। আমার উষ্ণ নিশ্বাসে সে শুকিয়ে গেছে। আপনার বর্ত্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে আমি পরিচিত নই—কিন্তু পূর্ব্বে যা ছিল আমিও আজকাল সেই রকম ভাবি—একজন ন্যায়বান্ পরমেশ্বর কোথায় আছেন কি-না? বয়েস হ'লে নাকি ভগবানে বিশ্বাস বাড়ে, আমার তো দেখ্‌ছি উল্টো। কিন্তু সে যাক।

জীবনের কাছে দু'দুবার ব্যাকুল হ'য়ে হাত পেতে ব্যর্থমনোরথ হয়েছি—তাই স্থির করেছি আর তাঁর কাছে কিছু চাইব না। অন্ততঃ ব্যাকুল কামনা নিয়ে চাইব না। সে বড় জ্বালা। চাকুরী করেছি সম্বল--অভাব আমার জীবনে অল্প দিন গুণ্‌ছি ঝরাপাতার মতো কবে জীবনের ডাল থেকে খ'সে যাব। মনের স্থিরতা অনেকটা পেয়েছি—তা ফের না হারাতে হ'লে আপনার সান্নিধ্য আমার অবাঞ্ছনীয় আশা করি আমার মানে আপনি বুঝবেন। আপনাকে সেদিন কিছু বল্‌তে পারি নি, তাই এ পত্র। ইতি।

তার পর বৃদ্ধ পণ্ডিত বিজয়কুমারের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল—আবোল-তাবোল যা তা বকিয়া এক দীর্ঘ পত্রে তিনি রমার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। এই বলিয়া সে-পত্র শেষ করিলেন যে জীবনেরই এই অভিপ্রায় যে তাঁহারা মিলিত হন, নহিলে আবার এমন করিয়া আশ্চর্য্যভাবে সাক্ষাতই বা তাঁহাদের হইবে কেন?

রমার উত্তর আসিল:

"আমায় ক্ষমা করুন। এই সব কথা আর বলিবেন না, তাহা হইলে চিঠির উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইবে।"

কিন্তু মানুষের সংকল্প দেখিয়া বিধাতা পুরুষ হাসেন।

পরের এক বৎসর স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশের মধ্যে দুইজনার একাধিকবার দেখাও হইল কিন্তু রমার সেই এক উত্তর—"না" বৎসরের শেষ ভাগে হঠাৎ বিজয়কুমার ভীষণ রোগে পড়িলেন—প্লুরিসী। উপভোগের কামনা যাহা করিতে পারে নাই এবার সেবার প্রয়োজন তাহাই করিল। একদিন শীতের তুহিনার্দ্র সন্ধ্যায় এক মুমূর্ষু রোগীর সঙ্গে রমার অবশেষে সত্যিই বিবাহ হইয়া হইয়া গেল—অবশ্য রেজেষ্ট্রী করিয়া।

বিবাহের দুই মাস পরে এক ফাল্গুনের সন্ধ্যায় বিজয়কুমার নিজের বাংলোর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া আছেন। রোগ সরিলেও দেহে প্রচুর দুর্ব্বলতা। এমন সময় রমা সুপ লইয়া আসিল।

"এটুকু খেয়ে ফেল ত।"

"দাও—" একটু একটু করিয়া চুমুক দিতে দিতে বিজয়কুমার বলিলেন—"রমা—এই দ্বিতীয়বার তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুললে। তোমায় এ সময় না পেলে নির্ব্বান্ধব আমার কি দশা হোতো ? আমি কিন্তু নিজেকে ভাগ্যবান্ই মনে করি! আযৌবন দেহমন দিয়ে একাগ্র কামনা করেছি· তা আমার সত্যি লাভ হোলো।"

রমা বলিল, "আর আমি সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে তবে ভাগ্য-দেবতাকে হাতে পেলাম। ভাগ্যবতী আমিই কম কিসে ? শুধু জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এই কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

সুরুয়ার পেয়ালাটা রাখিয়া বিজয়কুমার রমাকে পাশে বসাইলেন ও তাহার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেন রমা, সন্ধ্যার কি নিজের গৌরব নেই—সে কি তুচ্ছ ?"—আস্তে আস্তে আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind .
In the primal sympathy
Which having been must ever be
In the soothing thoughts that spring
Out of human suffering ;
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind.

সমাপ্ত